মার্চ ২০২৫ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

স্বাধীনতার গল্পগুলো

মো. সাইফুল্লাহ্ সিয়াম, পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

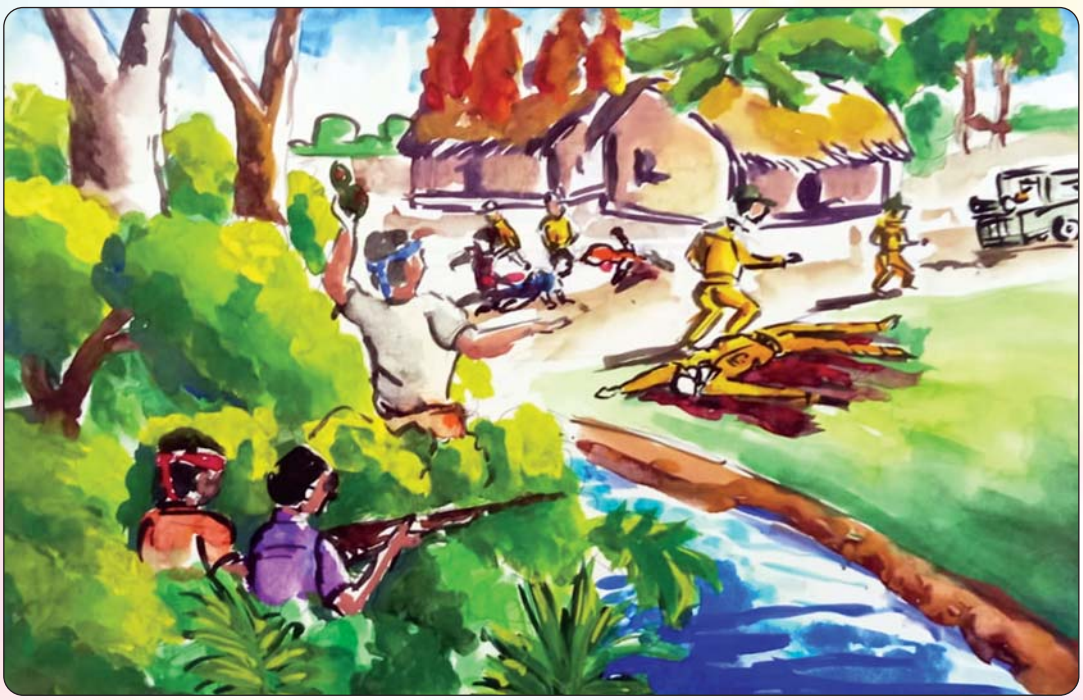

মুহিব-ই যাহরা ফিজা, অষ্টম শ্রেণি, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পাদকীয়

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। এ অগ্নিঝরা মাসেই বাংলাদেশের মানুষের মনে জ্বলেছিল ক্ষোভের আগুন। এসেছিল আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত ডাক। মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এ মাসেই। তাই মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য মাস। স্বাধীনতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে বাঙালি বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে এ মাসেই।

বন্ধুরা, ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর নামে নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির উপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। সেই রাতে ঘটেছিল ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা, যা ছিল বাঙালি প্রজন্মকে নিশ্চিহ্ন করার এক নারকীয় পরিকল্পনা।

পরিশেষে অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা ও স্বাধীন ভূখণ্ড। এখন এটিকে সমুন্নত রাখতে হবে আমাদের। পড়ালেখা করে ভালো মানুষ হতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে একসাথে থাকতে হবে। চর্চা করতে হবে দেশীয় ভাষা-সংস্কৃতি। জানতে হবে স্বাধীনতার ইতিহাস। মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করতে হবে। দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করতে হবে। এতে বিশ্বের বুকে দেশের সম্মান আরো বাড়বে। সুসংহত হবে আমাদের স্বাধীনতা।

তোমাদের লেখা ও আঁকা ছবি সমৃদ্ধ করবে নবারুণকে। ভালো থাকবে সবসময়।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

৫১ পদ্মরেশম/ আতিকুর রহমান
৫৬ তিমিরাও গান গায়/ইশমাম রাজ
৬১ বুদ্ধির খেলা/ নাদিম মজিদ

গল্প

৮ জামতলার শহিদ/আহমদ মতিউর রহমান
১৬ রুনুর লাল মুরগি/আশিক মুস্তাফা
২০ মেয়েটির নাম জানা হয়নি/দীপু মাহমুদ
২৪ রঙিন আলোর ফোয়ারা/ নাসীমুল বারী
২৭ রুম্পা ও পরিবন্ধু/সনজিত দে
৩১ সামনে নতুন দিন/ইউনুস আহমেদ
৩৫ দাদুর পতাকা/শাকিব হুসাইন
৪২ স্বাধীনতার সুখ / শারমিন নাহার ঝর্ণা
৪৪ এক কিশোরের যুদ্ধ/ তূয়া নূর
৪৭ অপারেশন ধলেশ্বরী/অলোক আচার্য
৪৯ পতাকা বুড়ো/ খান সাকিব-উল-হুসেন

প্রতিবেদন

৫৩ শিশুর নিরাপত্তায় করণীয়/ মেজবাউল হক
৫৪ ক্যামব্রিজে 'কিউরি পেক্রা উও'
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৪ শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপায়
আরমান হোসেন দেওয়ান
৫৫ মুগ্ধের চমক/শাহানা আফরোজ
৫৭ শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৮ অদম্য নারী পুরস্কার পেলেন যারা/ জান্নাতে রোজী
৫৯ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কবিতাগুচ্ছ

০৩ জাকির আবু জাফর
১২ রানাকুমার সিংহ
১৩ এম হাবীবুল্লাহ/আবু তৈয়ব মুছা
১৪ বিজন বেপারী/এস ডি সুব্রত
১৫ সাজিয়া আফরিন/সালাম ফারুক
৩৪ তামিম আল হাদী

স্মৃতিকথা

০৪ ১৯৭১ এর উত্তাল মার্চে/ রেজাউল করিম খোকন

ছোটোদের গল্প

৩৯ ছায়ামানবের স্বাধীনতা যুদ্ধ/ তৌসিফ হাসনাত আনান

ছোটোদের ছড়া

৩৮ সুস্মিতা চৌধুরী
৪৩ মো. জাবির আহমেদ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মো. সাইফুল্লাহ্ সিয়াম
মুহিব-ই যাহরা ফিজা
তৃতীয় প্রচ্ছদ : জয়িতা দে/ তাইফুর আলম
শেষ প্রচ্ছদ : অনিন্দিতা ভাবুক
৬২ নীলাদ্রি শেখর সমদ্দার
৬৩ সাবিত হক/ মৌমিতা আক্তার বন্যা
৬৪ মোছা. ওকি/ জারিন আক্তার

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

স্বাধীনতার গল্পগুলো

জাকির আবু জাফর

স্বাধীনতার গল্পগুলো শুনতে হবে
ভবিষ্যতের স্বপ্ন আশা বুনতে হবে।
স্বপ্ন থেকে সম্ভাবনার জ্বালবে বাতি
কেউ হবে না আর হবে না আত্মঘাতী!

স্বাধীনতার মর্যাদাকে বুঝতে আসো
হৃদয় দিয়ে দেশকে সবাই ভালোবাসো।
ভালোবাসার বিকল্প আর হয় না কিছু
আর করো না কারো কাছেই মাথা নীচু।

স্বাধীনতা রক্ষা করার শপথ করো
বাংলাদেশের মাটির গন্ধে হৃদয় ভরো।
সবুজ মাখা এই মায়াবী দৃশ্য দেখো
নিত্য তুমি স্বাধীনতার গল্প লেখো।

তোমার জন্য এই পৃথিবী তাকিয়ে আছে
ভবিষ্যতের মন্ত্রখানি তোমার কাছে।
তুমি তোমার বুকের ভেতর দেশকে রাখো
স্বাধীনতার লাল গোলাপের গন্ধ মাখো।

তুমি স্বাধীন দেশও স্বাধীন কী যে সুখের
নতুন করে উজাও হাসি নতুন মুখের।
যেই হাসিটি বাংলাদেশের সবার হাসি
এমন দেশটি আমরা সবাই ভালোবাসি।

স্মৃতিকথা

১৯৭১ এর উত্তাল মার্চে...

রেজাউল করিম খোকন

‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো’।
‘তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা’।

একদল মানুষ স্লোগান দিতে দিতে মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে। স্লোগান শুনে কৌতূহলী হয়ে আশপাশের বাড়িঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে রাস্তায়।

দেশের পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। মার্চ মাসের শুরু থেকেই চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। কিছু একটা ঘটবে এবার। আর চুপ করে থাকার দিন শেষ হয়েছে। এবার প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। শাসকদের সব অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের অধীনে থাকার কোনো মানে হয় না। সব হিসাবের পাওনা এবার বুঝে নিতে হবে। বাঙালির ঘরে ঘরে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। শোষণ-বঞ্চনার নাগপাশ মুক্ত হওয়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছে বাংলার মানুষ। সবার রক্তে টগবগ করছে দেশকে স্বাধীন করার অদ্ভুত এক টান।

বাইরে মিছিলের স্লোগান শোনা যাচ্ছে। খুব কাছে চলে এসেছে মিছিলটা। রাজু ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে ছুটে যায়। ক্লাস ফাইভে পড়ে সে। চট্টগ্রাম শহরে বাড়ির পাশেই হামিদিয়া সরকারি প্রাইমারি স্কুল। সেই স্কুলের ছাত্র রাজু। ক্লাস ওয়ান থেকেই ভালো ছাত্র হিসেবে তার আলাদা সুনাম এবং পরিচিতি। ক্লাস ফাইভের প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে, জানুয়ারি থেকেই স্কুলের সব শিক্ষকের নানা পরামর্শ, নির্দেশনা ও মনোযোগ রাজুর মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করলেও দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার মনে সংশয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করেছে। দিনে দিনে দেশের পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। রাজুর বয়স মাত্র ১০ বছর। এই বয়সে রাজনৈতিক উত্তাপ অনুভবের কথা নয় তার। কিন্তু ওদের বাড়ির পরিবেশটা আলাদা। অন্য অনেক বাড়ির মতো নয়। বাড়ির পরিবেশ যেন অনেক বিষয়ে তাকে সচেতন করে তুলেছে আরো ছোটো বয়স থেকেই। বাসায় রোজ দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। এই এতটুকু বয়সেই পত্রিকা পড়ার অভ্যাস দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করতে অনেকটাই

সহায়তা করেছে। প্রতিদিনই এলাকার নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে, আলোচনা করতে অনেক মানুষই আসে তাদের বাড়িতে। বাবার কাছে আসা রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, মানুষজন এবং তার বন্ধুবান্ধবদের কথ াবার্তা শুনতে শুনতে রাজুর মনে উপলব্ধি হয়– খুব খারাপ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ, দেশের সব মানুষ। প্রতিটি বাঙালির অন্তরে নতুন করে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এখন সবাই স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন সবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিজেদের লড়াকু সৈনিক ভাবতে শুরু করেছে।

রাজু নিজের চোখেই দেখছে তাদের বাড়ির আশপাশের এলাকার পরিস্থিতি। আজকাল স্কুলেও যাচ্ছে না সে। স্কুলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই এখন। কখন, কোথায় কী ঘটে যায়- তেমন আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে সবাই। স্কুলে যেতে রাজুর মা নিষেধ করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে তার স্কুলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। স্কুলের দূরত্ব খুব বেশি নয়। কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই স্কুলে পৌঁছে যায় রাজু। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসছে না গত কয়েকদিন থেকে। রাজু বাড়ি থেকে বেরিয়ে একছুটে স্কুলের সামনে গিয়ে দেখে আসে প্রতিদিন কয়েকবার। কিন্তু স্কুলের ক্লাসরুমের দরজা বন্ধ এবং সামনের মাঠ ফাঁকা দেখে বার বার ফিরে এসেছে মন খারাপ করে। দিন যত গড়াচ্ছে দেশের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হচ্ছে। সবাই স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে নিজেদের এক একজন সংগ্রামী যোদ্ধা ভাবতে চাইছে। ছোট্ট কিশোর হলেও রাজুর মধ্যে এক ধরনের চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। চরম অস্থিরতা, আতঙ্ক এবং নানা শঙ্কার মধ্যে দিনগুলো কাটছে। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিরোধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় ভেতরে ভেতরে। এর মধ্যে ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা 'অপারেশন সার্চ লাইট' শুরু করে পাকিস্তানি সৈন্যরা, নিরস্ত্র নিরপরাধ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নির্বিচারে হত্যা করে বহু নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবককে। তারা ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায়। নৃশংসভাবে গণহত্যা করে।

তাদের বাড়ির খুব কাছে চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশনের যে ট্রান্সমিশন অফিসটি রয়েছে, সেখানে ইপিআরের অনেক বাঙালি সদস্য এসে জড়ো হয়েছেন। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে স্থানীয় তরুণ-যুবক, মাঝবয়সি মানুষজন। সবাই হানাদার বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তেমনি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে গোটা জাতি যখন দ্বিধা, শঙ্কা, অনিশ্চয়তার দোলাচলে ভুগছে তখন হঠাৎ করে রাজুদের বাসার কাছে চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশনের ট্রান্সমিশন অফিসটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

সবার কাছে অপরিচিত মনে হলেও সেই অকুতোভয় স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত স্বাধীনতার ঘোষণা মুহূর্তের মধ্যেই গোটা বাংলাদেশ জুড়ে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে।

দুই

কালুরঘাট ট্রান্সমিটার কেন্দ্রটি রাজুদের বাড়ির খুব কাছে হওয়ায় এক দৌড়ে সেখানে চলে যাওয়া যায়। সবাই ছুটে যাচ্ছে বেতারকেন্দ্রের দিকে। রাজুর খুব ইচ্ছে করে সেখানে ছুটে যেতে। কীভাবে স্বাধীনতা ঘোষণাটি ইথারে ইথারে রেডিওর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা দেখার সাধ জাগে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করার পর পরই বেতারকেন্দ্রটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র'।

এর মধ্যেই বেতারকেন্দ্রের আশপাশে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ১০-১২ জন স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালন শুরু করেছে। তারা বেতারকেন্দ্রে ইপিআরদের সাথে মিলেমিশে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। বেতারকেন্দ্রের আশপাশের সুরক্ষার জন্য বেশ অনেকগুলো বাংকার তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন উৎসুক হয়ে বেতারকেন্দ্রের কর্মকাণ্ড দেখার জন্য ভিড় করছে। রাজুর বাবা ডাক্তার রাকিব স্থানীয় চিকিৎসক হিসেবে আহত ও অসুস্থ ইপিআর সদস্যদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় তরুণ নেতাদের বেশ কয়েকজন সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। এক ফাঁকে সাহস করে বাবার কাছে আবদার করে সে, 'আব্বা, আমিও যাবো তোমার সাথে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে। সবাই যাচ্ছে, আমার অনেক ইচ্ছে করছে সেখানে যেতে।'

'ঠিক আছে, চলো। তবে ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। যে-কোনো সময় পাকিস্তানি বাহিনী এই বেতারকেন্দ্রে হামলা করতে পারে। সবাই এক ধরনের অনিশ্চয়তা এবং শঙ্কার মধ্যে রয়েছে সেখানে।' রাজু বাবার সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ভেতরে ঢোকে। সবাই হাতে অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বাংকারের ভেতর ইপিআর সদস্যরা অস্ত্র তাক করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে।

বাড়িতে রেডিওর সামনে অনেক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার মধ্যে সবাই স্বাধীনতার ঘোষণাটি বার বার শুনছে। সবার মধ্যে উত্তেজনার পাশাপাশি এক ধরনের প্রত্যয়ের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করে রাজু। খুব ভালো লাগে তার। এত ভয়, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ যেন ছড়িয়ে পড়ছে মনের আনাচে-কানাচে। সবার সেই প্রত্যয় পাকিস্তানি দুঃশাসন আর শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার।

জীবনে এমন বিরূপ অবস্থায় কেউ পড়েনি কোনোদিন। বিপদের এই মুহূর্তে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে সবাই। এরপর কী ঘটে তা নিয়ে চিন্তিতও সবাই। রাজুদের বাড়িতে শহর থেকে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নিলেও এ জায়গাটা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ক্রমেই বিপদজনক অবস্থান হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানি বাহিনী যে-কোনো সময়েই বড়ো ধরনের আক্রমণ চালাবে এই বেতারকেন্দ্রে। পাকিস্তানি

বাহিনী আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা করেছে। যে কারণে রাজুদের বাড়ির আশপাশের গোটা এলাকা থেকে সবাই নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে দলে দলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে। ব্যাপারটা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

তিন

আজ ৩০শে মার্চ।

হঠাৎ দূর থেকে বিমান উড়ে আসার শব্দ পাওয়ামাত্র বাড়ির মধ্যেকার সবাই সচকিত হয়ে উঠে। ক্রমেই বিমানের শব্দ আরো কাছে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটা কোনোভাবেই হেলাফেলা করার মতো নয়। বাড়ির মুরুব্বিরা উঠানে খেলায় মত্ত থাকা শিশু-কিশোরদের ঘরের মধ্যে দ্রুত চলে যেতে বললেন। ভয় পেয়ে তারা সবাই খেলা বাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ততক্ষণে পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলো পুরো এলাকায় কয়েকবার চক্কর দিয়ে ফেলেছে। দ্রুতই খুব নিচে চলে এসেছে বিমানগুলো। এর বিকট শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে। ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে সবাই দরজা-জানালা বন্ধ করে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। বয়স্করা নানা ধরনের আশঙ্কা করছেন। সবাই ঘরের ফ্লোরে উপুড় হয়ে শুয়ে দোয়া-দরুদ পড়ছেন। পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলো যেভাবে খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তার ভয়ংকর শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকলেও বিমানগুলোর তীব্র শব্দ সবাইকে অস্থির এবং আতঙ্কিত করে তুলেছে। কারণ, এর আগে তেমন ভয়াবহ বিমান আক্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না কারোরই। রাজুর মনে হচ্ছিল, বিমানগুলো বাড়ির একেবারে ছাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যুদ্ধবিমান থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হলো। টানা কয়েক মিনিট ধরে চলল বোমাবর্ষণ। প্রতিটি বোমা পড়ার সময় এত ভয়ংকর শব্দ হচ্ছিল তাতে সবার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা। দাঁতে দাঁত চেপে সবাই শব্দের সেই ভয়াবহতা সহ্য করে কোনোভাবে। মূলত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করে দিতেই পাকিস্তানিরা বিমান দিয়ে বোমা হামলা করেছে। এটাই ছিল বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর সর্বপ্রথম বিমান হামলা। প্রতিটি বোমা বর্ষণের সময় পুরো এলাকার অনেকটা অংশ জুড়ে ঘরবাড়ি, দরজা, জানালা থরথর করে কাঁপতে থাকে। সবার আশঙ্কা ছিল, পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলো স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের আশপাশে জনবসতিতেও বোমা হামলা চালিয়ে ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না ঘটায় সবাই হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচে। বিমান থেকে যদি আশপাশের গ্রামগুলোতে বোমা ফেলা হতো তাহলে কারো বাঁচার আশা ছিল না। পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তু স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে কয়েকটি বোমাবর্ষণ করে একসময় ফিরে যায় বিমানঘাটিতে। ❑

গল্পকার

গল্প

জামতলার শহিদ

আহমদ মতিউর রহমান

সবেমাত্র গরম পড়তে শুরু করেছে। চৈত্র মাস। এই মাসটার কথা মনে রাখে মনজুর। মনজুর হোসেন নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্র। তাদের বাড়ি কিন্তু ঢাকা জেলাতে নয়, কুমিল্লা জেলাতে। ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা জেলার এই শহরটায় থাকে বড়ো ভাইয়ের বাসায়। বাসা বলতে খানপুরের একটি নব নির্মিত বাড়ি। লেখাপড়ার জন্য আসা এক চিলতে এই বাড়িতে। তবে বাড়িটিতে কিছু খালি জায়গা আছে। সেখানে গাছ লাগানো শুরু করেছে মনজুর। আশপাশে গ্রামীণ পরিবেশ।

চৈত্র মাসের সতেরো তারিখে বেলতলি বাজারের কাছে বদরপুরে এক মেলা শুরু হয়। সেই মেলা থেকে প্রতি বছর এটা সেটা কেনে। জিলিপি, বাতাসা আর মোয়া-মুড়কি কিনে খায়। জলিল কাকার সাথে সার্কাস দেখে। মেলা বেশ টানে গ্রামের ছেলেদেরকে। তাই চৈত্র মাসটির কথা মনে থাকে তাদের। মনে থাকে মনজুরেরও।

সেই ক্লাস ফোরে পড়ার সময় গ্রামের সাথে মনজুরের বিচ্ছেদ। তার মনে হয়েছে গ্রামেই সে ভালো ছিল। সেই সকালবেলায় অবারিত মাঠে হেঁটে বেড়ানো, দুপুরে পাখির বাসা খোঁজা, বিকেলে বাড়ির আঙিনায় বা বাড়ির পাশে আসগরিয়া স্কুলের মাঠে ফুটবল, ভলিবল বা দাঁড়িয়াবান্ধা খেলা। ভালো স্কুলে লেখাপড়ার জন্য ভাইয়ের বাসায় যেতেই হলো তাকে। তখন তারা ছিল মুন্সিগঞ্জে। দেখতে দেখতে মুন্সিগঞ্জে ধলেশ্বরী নদীর পারের শহরটিতে কাটিয়ে দিল তিনটি বছর।

এখনো চোখে ভাসে ইদ্রাকপুর কেল্লা, হাসপাতাল পাড়া, আদালত পাড়া, মুন্সেফপাড়া। মনজুরের বড়ো ভাই মহকুমার বড়ো মেডিক্যাল অফিসার। এসডিএমও। সরকারি ডাক্তার। এসডিএমও কী জানে না মনজুর। একবার জানতে পেরেছিল। কিন্তু ভুলে গেছে।

আবার হঠাৎ বদলি বড়ো ভাইয়ের। বদলির চাকরি, কিছু করার নেই। ছাড়তে হলো মুন্সিগঞ্জ। তারপর নারায়ণগঞ্জে আসা। কাছাকাছি দুটি শহর।

উনিশ'শ ঊনসত্তর। মনজুর মুন্সিগঞ্জ হাই স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। ভালো স্কুল। বড়ো বড়ো কয়েকটা ভবন। তবে নিচতলার ক্লাসরুমগুলোর জানালায় কোনো শিক নেই। ক্লাস শেষে দুষ্টু ছেলের দল সেই জানালা গলিয়ে বের হয়ে যেত। পাশে একটি রাস্তা। রাস্তার ওপারেই ইদ্রাকপুর কেল্লা ও বাগান। সেই বাগানে সবাই খেলত।

: জানিস কাল না মিছিল হয়েছে চর কেওয়ার স্কুলে। আমাদের স্কুলেও মনে হয় হবে। ক্লাসমেট বাশার খবরটা দিল।

: কীসের মিছিল? জানতে চায় মনজুর।

: শুনিসনি কিছু? চারদিকে আন্দোলন সংগ্রাম চলছে?

: না রে বল না। তুই কী করে জানলি?

: আমার বড়ো ভাই হরগঙ্গা কলেজের ছাত্র। ওরা প্রতিদিন মিছিল করে। স্বায়ত্বশাসন চায়। প্রেসিডেন্ট আইউব খানের শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন।

: না শুনিনি। বলতো ভাই।

: দেখ আমরা পাকিস্তানের বড়ো অংশ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি। কিন্তু সবকিছুতেই বাঙালিরা পিছিয়ে। ছাত্ররা অধিকার ফিরে পেতে চায়। তাই আন্দোলন।

কথা আর শেষ হয় না।

কয়েক দিন যেতে তাদের স্কুলের গেটেও আসে বড়ো ভাইরা।

এক দিন স্কুলের ছাত্ররা নেমে আসে মাঠে। তারপর রাস্তায়। কলেজের বড়ো ভাইরা তাদের নিয়ে মিছিল করে কোনো দিন চলে যায় মুন্সিরহাট পর্যন্ত। কোনোদিন মীরকাদিম পর্যন্ত।

এভাবে চলছিল। একদিন ভাই বদলি হয়ে গেলেন।

আন্দোলনে আর যাওয়া হলো না।

উনিশ'শ সত্তর। নারায়ণগঞ্জ শহর। ঢাকা যেতে হয় ফতুল্লা শ্যামপুর পোস্তখোলা হয়ে। মনজুর ঢাকায় যেত তার ভাবির সাথে নিউমার্কেট, বায়তুল মোকাররমে বাজার করতে। ঈদ বাজার। জামা জুতো কেনার জন্য। আর যেত খিলগাঁও। ভাবির বাবার বাড়ি।

দুই

ভরদুপুরে লবাইর কান্দি বাজারের পাশে বসে আছে মনজুর। স্কুল ছেড়ে আসা বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে। একটা পাখি ফুরুৎ করে উড়ে গেল। আহ! পাখিটার কি স্বাধীনতা । সে উড়তে পারছে। কিন্তু তাদের স্বাধীনতা নেই। সরকার যা বলবে তাই। বাঙালিরা কিছু বলতে পারবে না। বাংলা ভাষার দাবি করতে গিয়ে কত প্রাণ ঝরে গেল। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি এলে শহিদমিনারে ফুল দিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় সবাই।

নারায়ণগঞ্জ স্কুলে আছে শহিদমিনার। এবার সে নিজে ফুল দিয়েছে। ক্লাস এইটের ছাত্র বলে ভলান্টিয়ারিও করেছে। এবার কয়েকজন বক্তা এসেছিলেন। অনেক কথা বলেছেন। সব বুঝতে পারেনি মনজুর। তবে এটা বুঝেছে গত বছরের নির্বাচনে বাঙালিরা অনেক ভোট পেয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা না পেয়ে হতাশ হয়েছে তারা।

পাখিটা অনেক দূরে চলে গেছে উড়তে উড়তে।

আহা সে পাখি হলে ভালো হতো।

তিন

মার্চ, উনিশ'শ একাত্তর। বাংলা চৈত্র মাস। বড়ো ভাই বললেন তোমরা ভাইবোনেরা মিলে গ্রামের বাড়ি চলে যাও। সামনে খারাপ কিছু হতে পারে। মনজুর আর তার দুই বোন গ্রামে ফিরে এল। দেখতে দেখতে দিন যাচ্ছে। পাখির বাসা খুঁজে ফেরা, জাল দিয়ে মাছ ধরা এসব করে দিন যাচ্ছে।

মনজুরের মতো আরো ছেলে-মেয়েরা গ্রামে ফিরে এসেছে।

এখন গ্রামেই কাটে তাদের দিন।

২৫শে মার্চ এল দুঃসংবাদ নিয়ে। সামরিকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালিদের উপর। গ্রামে চলে এল সে খবর।

বহু মানুষ নিহত হয়েছে ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় ইপিআর সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন এলাকায় রাতের অন্ধকারে অভিযান চালায় সামরিকবাহিনী।

এসব শুনে মনটা দমে যায় মনজুরের। হয়ত এই ভয়েই ভাইয়া সবাইকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ছেঙ্গারচর একটা বড়ো বাজার। ২৬শে মার্চ দুপুরের দিকে বড়ো এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে বের হয় মনজুর সেই বাজারে যাওয়ার জন্য। পথে দেখা হলো অনেকের সাথে। সবার মুখই থমথমে।

: ঢাকার খবর ভালো না রে গেসুদ্দি। কোনো কিছু হুনছস নাকি?

পথে একজন জানতে চায় মনজুরের চাচাতো ভাই গিয়াস উদ্দিনের কাছে।

তিনি বললেন-

: কিছু শুনি নাই। তবে গোলমাল হয়েছে, মানুষ মারা গেছে শুনেছি। আপনি খবর বলেন কাকু, বললেন গিয়াস।

: আমিও ওই রহমই হুনছি। তোর ভাইয়ের কী খবর? ডাক্তার সাহেবের।

: কোনো খবর পাই নাই। খারাপ বা ভালো কোনো খবরই না। চিন্তায় আছি চাচা।

: চিন্তা তো আমারও। তাই জিগাইলাম।

বাড়িতে ফিরে রেডিও নিয়ে বসে মনজুর। রেডিওতেও তেমন কোনো খবর নেই। কারফিউ জারি হয়েছে।

ঘরে থাকার নির্দেশ। কারফিউয়ের নানা নির্দেশিকা।

একদিনও যায়নি। কালিপুর বাজার থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসে সাদেক চাচা। কালিপুর বাজার মনজুরের বাড়ি থেকে উত্তরে। সেই বাজারের লঞ্চঘাট থেকে লঞ্চে করে নারায়ণগঞ্জ যেতে আসতে হয়। টানা সাড়ে তিন মাইল পথ হেঁটে আসতে ও যেতে হয়। বর্ষায় অবশ্য নৌকা করে যাওয়া যায়। কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার প্রত্যন্ত এই এলাকাটিতে পাকা রাস্তা বলতেই নেই। শুধু ডিসট্রিক্ট বোর্ডের কিছু সড়ক আছে। তারও আবার স্থানে স্থানে ভাংতি। মানে খালের মতো। হেঁটে খাল পার হয়ে আবার সড়কে উঠতে হয়।

মতলব থানার সর্ব উত্তরের বাজার এই কালিপুর। কয়েক দিন ধরে সবার দৃষ্টি কালিপুর বাজারে। কখন কে লঞ্চে করে আসে, খবর নিয়ে আসে, তাজা খবর।

সেই রকম তাজা খবর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আসেন সাদেক। সাদেক কম্পাউন্ডার। নারায়ণগঞ্জে একটি ফার্মেসিতে কাজ করেন।

বাড়িতে পৌঁছেই ধপাস করে মাটিতে বসে পড়েন সাদেক। তিনি জানালেন এক ভয়ংকর খবর। নারায়ণগঞ্জের জামতলায় ইপিআরের আর্মির গুলিতে মারা গেছেন মনজুরের এক চাচা বোরহান। কলেজের ছাত্র। কলেজ হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করত। তারা নাকি প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছিল। প্রথম প্রতিরোধ। সেই সময় মারা গেছে রানাসহ আরো কয়েকজন। কলেজ রোড এলাকার পরিচিত এক যুবক রানা। তারা আর্মির গাড়ি প্রতিরোধ করতে মাঝরাতে ব্যারিকেড দেয় জামতলার রাস্তায়। আর্মি গুলি করতে করতে তা ভেদ করে শহরে ঢুকে যায়। রাস্তা ভেসে যায় লাল লাল রক্তে।

বোরহানের মৃত্যুতে গ্রাম স্তব্ধ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে প্রত্যেকেই আপনজন হারা হয়েছে।

ডুকরে কেঁদে চলেছে মনজুর ও তার আত্মীয় স্বজনরা। ❑

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ভালোবাসি স্বাধীনতা

রানাকুমার সিংহ

ভালোবাসি বৃক্ষ, নদী
পাহাড়, সাগর, সবুজ পাতা
ভালোবাসি বৃষ্টি ও রোদ
কাকুর হাতে রঙিন ছাতা।

ভালোবাসি চাঁদমামা আর
মায়ের মুখে ছড়ার জাদু
ভালোবাসি গল্প সেসব
যা আমাকে শোনায় দাদু।

ভালোবাসি বাংলাদেশের
লাল-সবুজের পতাকাটা
ভালোবাসি শ্যামল বরণ
গাঁয়ের পথে একলা হাঁটা।

ভালোবাসি খুকুর মুখে
আধো বোলের কত কথা
ভালোবাসি ভালোবাসি
ভালোবাসি স্বাধীনতা।

প্রিয় স্বাধীনতা

এম হাবীবুল্লাহ

ভাই হারিয়ে পেলাম ফিরে
প্রিয় স্বাধীনতা
মায়ের চোখে কান্না দেখে
ভাঙল নিরবতা।

কান্না সে তো কান্না নহে
অগ্নি ভরা বান
দুই চোখ ভরা স্বপ্ন তাঁহার
হলো অবসান।

লাল-সবুজের পতাকাতে
ভাইয়ের স্মৃতি মাখা
ওই পতাকায় নতুন করে
হোক না স্বপ্ন আঁকা।

নতুন করে স্বদেশ গড়াই
হোক আমাদের পণ
দেশবিরোধী শত্রু সাবাড়
চলবে আমরণ।

অগ্নি ঝরা মাস

আবু তৈয়ব মুছা

অগ্নি ঝরা মার্চ এল
আর স্বাধীনতার বাণী,
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
আনল বিজয় ছিনি।

শহিদ হলো দেশের তরে
লক্ষ শত জন,
করল শ্মশান মায়ের মাটি
হায়েনা দুশমন।

ছাড়ব না তো বাংলা মায়ের
এক ইঞ্চি মাটি ,
রুখব তাদের সামন পানে
এ যে বীর বাঙালির ঘাঁটি।

রক্তে গড়া এই পতাকা
দৃঢ় শপথ চিতে,
আগলে রাখি যায় না যেন
দখল বাজির হাতে।

স্বাধীনতা

বিজন বেপারী

দোয়েল শ্যামা মুক্ত আহা
মুক্ত কোকিল পাখি
আজকে স্বাধীন বাংলা আমার
বুকেতে এই রাখি।

লাল পলাশের আবির মেখে
হাসে বাংলাদেশ
শহিদ ভাইয়ের প্রতি বুকে
শ্রদ্ধা অনিঃশেষ।

স্বাধীনতা হেসে ওঠে
নয়মাস যুদ্ধ শেষে
রাখি সম্মান এমন দেশের
সবাই ভালোবেসে।

স্বাধীনতার সুখ পাখিটি
লাল-সবুজ এক ঘুড়ি
মুক্ত আকাশ স্বাধীন আমি
ইচ্ছে স্বাধীন উড়ি।

প্রতিবাদের মন্ত্র

এস ডি সুব্রত

স্বৈরাচারের উদ্ধত শির
মিশেছিল ধূলোর পরে
শোষকের দুর্দণ্ড প্রতাপে,
হার মানেনি শোষিত সেদিন।
বিদ্রোহের অনল বুকে
উঠেছিল জ্বলে মুক্তির মিছিলে ,
ভয় দ্বিধাহীন চিত্তে
ভণ্ডের কপট খেলায়
দামাল ছেলেরা রুখে দাঁড়ায়।
স্বাধীনতা আজও চলার পথে
প্রতিবাদের মন্ত্র শেখায়।

অগ্নি ঝরা মার্চ

সাজিয়া আফরিন

লাল-সবুজের গর্বিত পতাকা
সোনালি রক্তে আঁকা মানচিত্র,
মুক্তিকামী বাঙালি রক্ত টগবগে
দেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় উদ্বৃত্ত।

নিপীড়ন নির্যাতন শোষণের গঞ্জনা
হৃদয়ে অনাহূত রক্তক্ষরণ,
অধরা স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্খা
বিজয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বেদনাবিধুর তীক্ষ্ম দৃষ্টি
অগ্নি ঝরা স্বাধীনতার মাস,
অন্তর্নিহিত শক্তি শাসকদের হুঁশিয়ার
গর্জনে উত্তাল জনসমুদ্রে ত্রাশ।

চিরতরে কণ্ঠ স্তব্ধে অপারেশন সার্চলাইট
নির্বিচারে বাঙালির প্রাণ নিধন,
রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শহিদের আত্মত্যাগ
মুক্তির প্রয়াস ভাষা আন্দোলন।

লড়াই

সালাম ফারুক

এই দেশে যা ঘটেছিল
একাত্তরের মার্চে,
আছে কি আর মহান কিছু
বলো দেখি তার চেয়ে?

বীর সাহসী ছাত্র-সেনা
হয়ে ওঠেন চাঙ্গা,
দখলদারের সঙ্গে চলে
সমানতালে পাঙ্গা।

নয় মাস ধরে লড়াই চলে
ঝরে কত রক্ত,
স্বাধীন হওয়ার লক্ষ্য ছিল
অবিচল ও শক্ত।

স্বৈরাচারের ভয়াল থাবা
পড়ল আবার বঙ্গে,
জাগল সবাই চব্বিশেতে
ছাত্র-যুবার সঙ্গে।

গল্প

রুনুর লাল মুরগি

আশিক মুস্তাফা

বড্ড একরোখা রুনু। তার পোষা মুরগিটাও! পাশ দিয়ে কেউই যেতে পারে না। অমনি তেড়ে আসে। তাড়া খেয়ে মা-গো, বা-বা-গো বলে দৌড়ায় ছোটোরা। বড়োরাও তাড়া খায় লাল মুরগির। দাদি বলেন, 'কই থেইক্যা আনলি এই রাক্ষুসটারে।' যারে পায় তারেই খাইতে চায়।' রুনু হাসে। তৃপ্তির হাসি। ছানাগুলোও হয়েছে মায়ের মতো। পান থেকে চুন খসার শব্দ হলেই চিউই, চিউই ডাকতে থাকে। অমনি তেড়ে আসে মা। লাল মুরগি মানুষ তাড়া করছে, এই দৃশ্য কী যে ভালো লাগে রুনুর। বুক ফুলে ওঠে গর্বে। তবে তার এই গর্ব বেশিদিন টেকে না। একদিন লাল মুরগিটা হারিয়ে যায়। কোথায়? কেউ জানে না!

রুনুরা গ্রামে থাকে। নয়ন পুকুরে।

এই নয়নপুকুর গ্রামে কিছু ঘটলেই রটে যায়। তার ওপর যদি হয় রুনুর দস্যি মুরগিটা তবে তো কথাই নেই! হন্যে হয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি খোঁজে রুনু। নেই, কোথাও নেই। একেবারে উধাও! বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে রুনু। চেনা-অচেনা যাকেই দেখে মুরগির কথা জিজ্ঞেস করে। কেউই কিছু বলে না। মন ভেঙে যায় রুনুর। সে কী করে বুঝায়, এই মুরগিই তার সব; রুনুর জীবনই যে লাল মুরগিটার জন্য! কী করবে ছোটো ছানাগুলো নিয়ে। দিনমান চিউই, চিউই ডাকে। কিছুই খেতে চায় না। কেবলই মাকে খোঁজে আর কোনো শব্দ শুনলেই দৌড়ে রুনুর জামার ভেতর লুকায়। রুনুই যেন তাদের মা!

এর মধ্যে গ্রামে মিলিটারি আসার খবর ছড়িয়ে পড়ে। রুনুর ছোটো কাকা বাড়িতে খবর নিয়ে আসে। বাড়ির বৌ-ঝিরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। দাদি বলেন, 'ও রুনু, জলদি চল, আমরা খাল পার হইয়া অই পাড়ে চইলা যাই। মিলিটারি সাঁকো বাইতে পারে না।' এর মধ্যে বাড়ির কেউ রান্না করা ভাতের পাতিল, কেউ ঘটি-বাটি, কেউ বিছানার চাদরে প্রয়োজনীয় জিনিস বেঁধে খালপাড়ের দিকে হাঁটা দেয়। দাদির সঙ্গে রুনুও। তার কোঁচড়ে লাল মুরগির ছানা। থেকে থেকে চিউই, চিউই ডাকে। রুনু দূর থেকে দেখে, খালপাড়ে মানুষের জটলা। সাঁকোর উপর মানুষের লাইন। যারা সাঁতার জানে তারা সাঁতরে খাল পেরোয়। একসময় আর কেউ থাকে না খাল পাড়ে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। নয়নপুকুর গ্রাম মানুষ শূন্য হয়ে যায়। এরমধ্যে পাকিস্তানিরা চলে আসে গ্রামে। ফাঁকা গুলি ছোড়ে। মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যায়। রাতে মশার কামড় খেয়ে ভোর রাতে তারা গ্রামে ফিরতে শুরু করে। দাদির সঙ্গে রুনুও বাড়ি ফিরে। কিন্তু বাড়ি এসে তারা ঘর খুঁজে পায় না। জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। থেকে থেকে তখনও ধোয়া উড়ছে। দাদি মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। রুনু কী করবে বুঝতে পারে না। তার তো মা নেই যে, মায়ের কোলে মাথা রাখবে। নেই বাবাও। মুরগির ছানাগুলো নিয়ে সে কী করবে? এর মধ্যে রহিম চাচা বলেন, 'না আর থাকা যাইব না। এইবার যুদ্ধে যাইতেই অইব।' রুনুও আর বাড়ি বসে থাকতে পারল না। যুদ্ধে যেতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল কোঁচড়ে মুরগিছানা নিয়ে। সবাই পিছু ডাকে। রুনু একরোখা। সে যুদ্ধে যাবে তো যাবেই। কারও পিছু ডাকে থামে না। একরোখা রুনু যুদ্ধের পথে নামছে তো নামছেই। বড়োদের যেখানে বুক কাঁপে রুনু সেখানে ডর-ভয় তোয়াক্কা না করে চলে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে। খুঁজে বের করে কমান্ডারকে। বলে, 'আমি যুদ্ধ করব।'

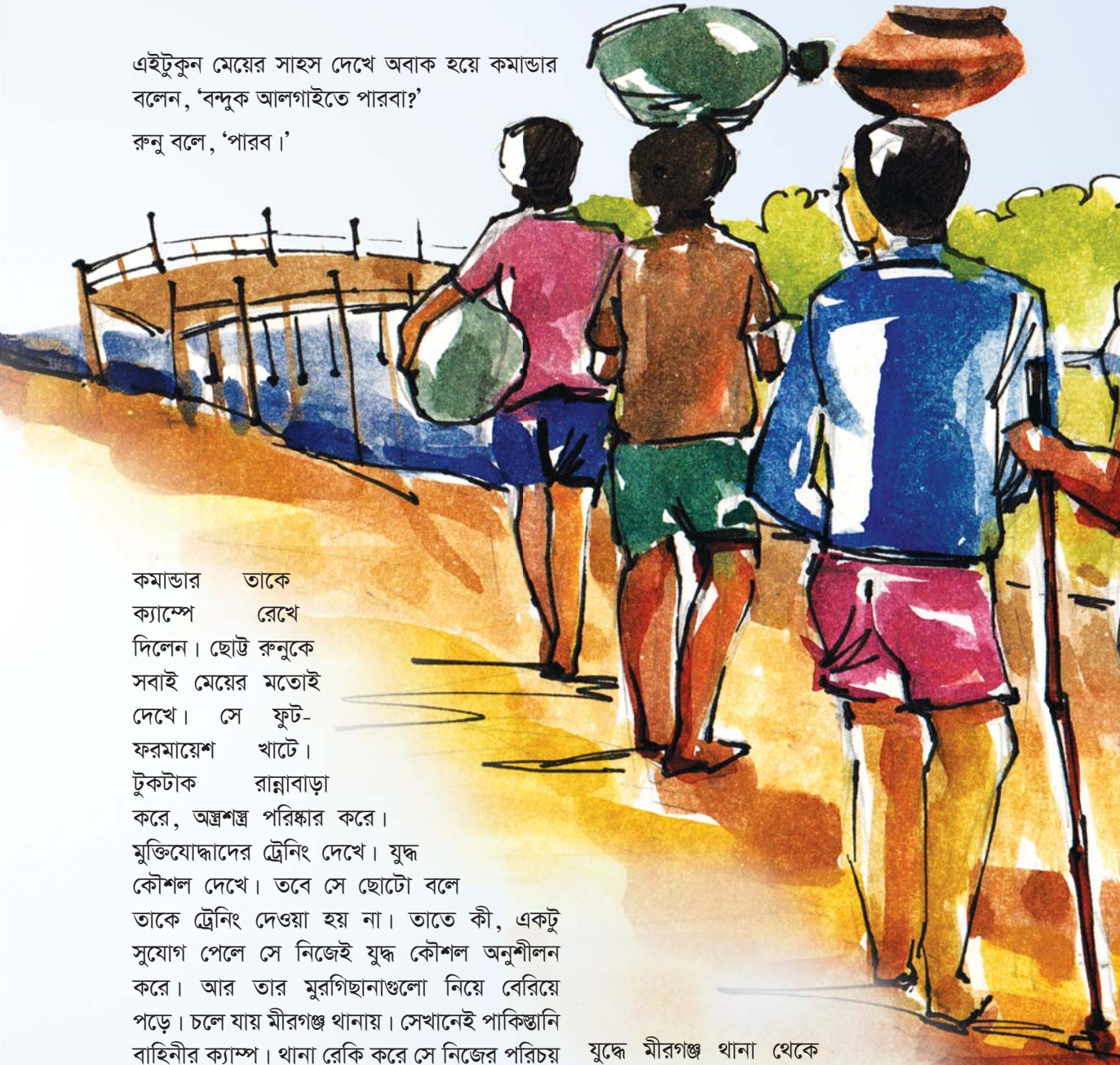

এইটুকুন মেয়ের সাহস দেখে অবাক হয়ে কমান্ডার বলেন, ‘বন্দুক আলগাইতে পারবা?’

রুনু বলে, ‘পারব।’

কমান্ডার তাকে ক্যাম্পে রেখে দিলেন। ছোট্ট রুনুকে সবাই মেয়ের মতোই দেখে। সে ফুট-ফরমায়েশ খাটে। টুকটাক রান্নাবাড়া করে, অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করে। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেখে। যুদ্ধ কৌশল দেখে। তবে সে ছোটো বলে তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয় না। তাতে কী, একটু সুযোগ পেলে সে নিজেই যুদ্ধ কৌশল অনুশীলন করে। আর তার মুরগিছানাগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চলে যায় মীরগঞ্জ থানায়। সেখানেই পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প। থানা রেকি করে সে নিজের পরিচয় গোপন করে খবর নিয়ে আসে। তারপর সেই তথ্যে ভর করে মুক্তিযোদ্ধারা হামলা চালায়। একদিন সে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে কোঁচড়ে ভরে মুরগির ছানার সঙ্গে তিনটি গ্রেনেড নিয়ে আসে। সেই গ্রেনেড পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা মীরগঞ্জ থানায় হামলা করে গভীর রাতে। অপারেশনে ছিল ছোট্ট রুনুও। গ্রেনেড ছুঁড়তে গিয়ে এক হাত হারিয়ে বসে রুনু। তবে সেদিনের যুদ্ধে মীরগঞ্জ থানা থেকে পাকিস্তানিরা ভয়ে পালিয়ে যায়। জয় পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধারা। ছোট্ট রুনুকে মাথায় তুলে আনন্দ মিছিল করে মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে আর কথা বলে না রুনু। একেবারেই চুপ।

ক্যাম্পের কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। তার প্রিয় লাল মুরগির ছানাগুলো চিউই চিউই

ডাকতে থাকে। তাকে সামনে নিয়ে রহিম চাচা বলেন, 'আমগো গ্রামে যেদিন পাকিস্তানিরা তাণ্ডব চালায় তার আগের দিন বাচ্চু রাজাকার আইছিল। সে-ই রুনুর লাল মুরগিটারে ধইরা নিয়া গেছিল। মুরগি হারাইয়া মাইয়াটার মন ভাইঙ্গা গেছে গা। এইটা দেইখা আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত আর মুরগি খামু না। আজ প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিনই আমি মুরগি খামু না।'

একসময় যুদ্ধ থামে। দেশ স্বাধীন হয়। ছোট্ট রুনুর সাহসিকতার কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একরোখা রুনু ঠিকই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। আর সেই নয়নপুকুর গ্রামের কেউ এখনও মুরগি খায় না। তাদের যে একরোখা ছোট্ট বীর রুনুর কথা মনে পড়ে! ❑

সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক

গল্প

মেয়েটির নাম জানা হয়নি

দীপু মাহমুদ

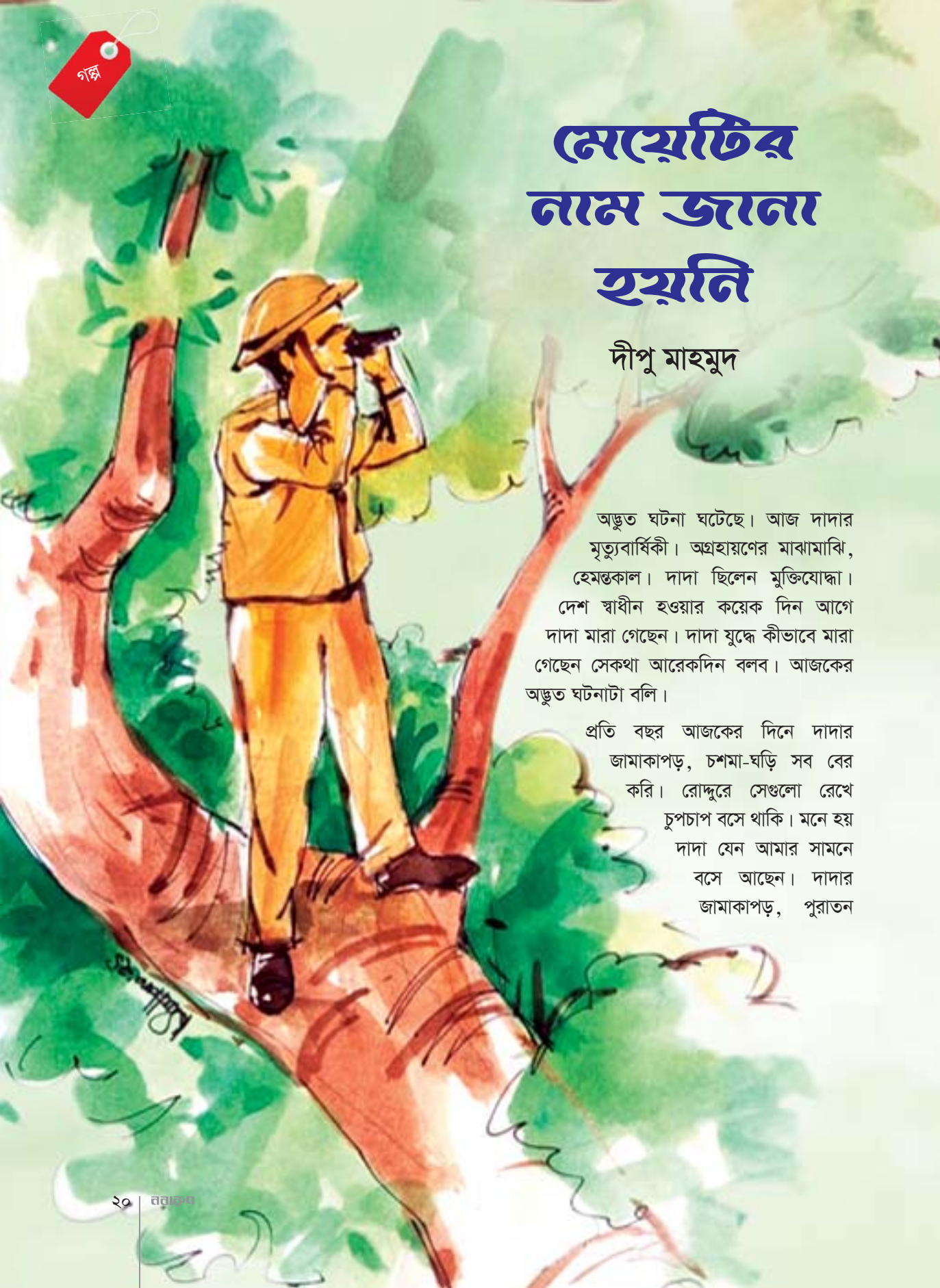

অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আজ দাদার মৃত্যুবার্ষিকী। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি, হেমন্তকাল। দাদা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক দিন আগে দাদা মারা গেছেন। দাদা যুদ্ধে কীভাবে মারা গেছেন সেকথা আরেকদিন বলব। আজকের অদ্ভুত ঘটনাটা বলি।

প্রতি বছর আজকের দিনে দাদার জামাকাপড়, চশমা-ঘড়ি সব বের করি। রোদ্দুরে সেগুলো রেখে চুপচাপ বসে থাকি। মনে হয় দাদা যেন আমার সামনে বসে আছেন। দাদার জামাকাপড়, পুরাতন

জিনিসপত্রের ভেতর আজ একখানা নোটখাতা পেয়েছি। দাদার লেখা। ছোট্ট নোটবই। দাদার শার্টের পকেটের ভেতর রাখা ছিল। আগে শার্ট তুলে রোদে দিয়েছি। পকেটে নোটবই খেয়াল করিনি। আজ খেয়াল করলাম। মায়ের কাছে শুনলাম দাদার মৃত্যুর পর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এসে দাদার জামাকাপড়ও ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই নোটবইটা দিয়ে গেছেন।

নোটবইতে মুক্তিযুদ্ধের সময় দাদা মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের কথা লিখেছেন। যেসব অপারেশনে দাদা ছিলেন। পড়তে পড়তে এক জায়গায় থামলাম। সেই জায়গাটা আবার শুরু থেকে পড়লাম। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। দাদা কী লিখেছেন বলছি।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা পথঘাট। একহাত দূরের কোনোকিছু দেখা যায় না। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস। এ বছর শীতের প্রকোপ ভয়াবহ। এই শীতের মধ্যে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর কুয়াশা উপেক্ষা করে রাতে আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পিঁপড়ের লম্বা সারির মতো এগিয়ে যাচ্ছি। টার্গেট চরখাইয়ের পাকিস্তানি সেনাদের ডিফেন্স পজিশন। ফুলবাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে পাকিস্তানি সেনারা চরখাইয়ে অবস্থান নিয়েছে।

আচমকা রাতের শূন্যতা চিরে সামনের গ্রাম থেকে ভেসে এল শত্রুর ভারী মেশিনগানের গুলি। সাঁ সাঁ করে গুলি মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা মাটি আঁকড়ে শুয়ে পড়লাম।

পাকিস্তানি সেনাদের ফায়ারের তীব্রতা বেড়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে শত্রু আমাদের আক্রমণের খবর আগেই জেনে গেছে। পাকিস্তানি শত্রুর দিক থেকে এমনভাবে ফায়ার আসছে যে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা মাটি থেকে মাথা তুলতে পারছি না। খানিকবাদে পাকিস্তানি সেনাদের ফায়ারের তীব্রতা কমে আসতে থাকল।

এই সুযোগে আমরা ডিফেন্স পজিশন ঠিক করে নিলাম। ভোরের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দূরে দেখা যাচ্ছে রেললাইন চরখাই হয়ে হিলি গেছে। রেললাইনের ওপারে চরখাই স্টেশনের লাল দালান। দালানের ওপরে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। বুঝতে পারলাম শত্রু জায়গা ছেড়ে যায়নি।

বেলা বাড়ছে। দু-পক্ষের তরফ থেকে ফায়ার আপাতত বন্ধ। পুরো এলাকায় শুধু শীতের সকালের শিরশির বাতাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আমাদের রাতজাগা চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু ঘুমানোর উপায় নেই। সামনে শত্রু। সজাগ থাকতে হবে। আমরা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলাম।

সামনে এগুতেই ডোপ-ডোপ করে দু'বার শব্দ হলো। বুঝতে পারলাম পাকিস্তানি সেনারা মর্টার ফায়ার করছে। মর্টারের গোলা কোথায় পড়ল সেটা বুঝতে পারলাম না।

তাড়াতাড়ি পাশের পুকুরের ঢালের আড়ালে শুয়ে পড়লাম। তখন আচমকা আমাদের দশ হাত দূরে মর্টারের গোলা প্রচণ্ড জোরে ফেটে পড়ল। আমরা পুকুরের ঢালের আড়ালে বসেছিলাম বলে গোলার স্প্লিন্টার আমাদের গায়ে লাগেনি।

আমরা উঠে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তখুনি আতঙ্কিত শব্দ শুনলাম। বুলেট এসে পাশের মুক্তিযোদ্ধার মাথার হেলমেটে লেগেছে। ট্যাং করে শব্দ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই বসে পড়লাম। বুঝতে পারছি শত্রুর স্নাইপারের নিশানার মধ্যে পড়ে গেছি। সামনে এগুনো সম্ভব নয়।

ভাবলাম যেভাবেই হোক স্নাইপারকে হটাতে হবে, নইলে আমাদের অনেকে নিহত হবে। খুব সাবধানে আমরা ক্রল করে পেছনে চলে গেলাম। সামনে উঁচু বাড়ি। দৌড়ে আমরা বাড়ির আড়ালে চলে যেতে চাইলাম। আমাদের হতবাক করে দিয়ে ট্যাংট্যাং করে দুটো বুলেট সেই বাড়ির দেয়ালে এসে বিঁধল। তার মানে হচ্ছে শত্রুর স্নাইপার আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। সে কাছেপিঠে কোথাও লুকিয়ে আছে। যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

আমরা নিজ নিজ বাইনোকুলার দিয়ে সামনের গাছপালা, ঝোপঝাড় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কোথাও স্নাইপারের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। বিস্মিত

হয়ে দেখলাম ডানপাশের খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে ১২-১৩ বছরের এক কিশোরী দৌড়ে আসছে।

আমার ভেতর অস্থিরতা শুরু হলো। চিৎকার করে বললাম, অ্যাই মেয়ে, গুলি হচ্ছে, বসে পড়ো। বসে পড়ো।

চিৎকার শুনে মেয়েটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের কাছে এল। সে তখনও হাঁপাচ্ছে।

বললাম, দেখছ না গোলাগুলি হচ্ছে! গুলি লেগে মারা যাবে তো, ভয়ডর নেই তোমার! কী হয়েছে, অমনভাবে দৌড়ে আসছ কেন?

মেয়েটি বলল, স্যার, এদিকে আসেন, জঙ্গলের কোনার বটগাছের ওপর এক মিলিটারি চ্যাংড়া বসে আছে।

বুঝতে পারলাম এই হচ্ছে লুকানো সেই স্নাইপার।

এলএমজি গ্রুপ সঙ্গে নিয়ে আমরা মেয়েটির পেছনে রওনা হলাম।

ঘন বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে দুটো কাদাভরা নালা পার হয়ে আমরা গ্রামের শেষ মাথায় এসে পৌঁছলাম। কচুরিপানা আর জঙ্গলে ভরতি পুকুর পাড়ে এসে মেয়েটি ধপাস করে বসে পড়ল। উত্তেজনা আর দৌড়ের ধকলে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। আমরাও সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম পুকুরের উঁচু পাড়ের আড়ালে, যাতে স্নাইপার আমাদের দেখতে না পায়।

পুকুরপাড় লতানো বেতগাছের ঝোপে ভরা আর বেতের কাঁটা ছড়িয়ে আছে সবখানে। তাতে আমাদের নড়াচড়া করতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। দেখলাম মেয়েটির হাত আর পা বেতের কাঁটার আঁচড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তবু সে অতি উৎসাহ নিয়ে বলল, খুব ভোরে এখানে এসেছিলাম। তখন দেখি একজন মিলিটারি গাছে উঠছে। চেহারা দেখেই বুঝেছি পাকিস্তানি মিলিটারি। ভয় পেয়ে বাড়ি চলে গেলাম। তারপর শুনি গোলাগুলি হচ্ছে। তখন মুক্তিবাহিনীকে দেখলাম। মনে হলো মুক্তিবাহিনীকে ঘটনা জানানো দরকার। তাই গোলাগুলিকে ভয় না করে চলে এসেছি। আপনাদের কাছে শত্রুর খবর পৌঁছানো জরুরি।

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিলাম। সেই মেয়ে আমাদের দেখিয়ে দিলো কোন গাছে শত্রু বসে আছে।

পুরো এলাকা ঘন ঝোপঝাড়ে ভরতি। সেখানে বটগাছ লম্বা হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। বটগাছের ডালে বসে আছে স্নাইপার। বাইনোকুলার দিয়ে আমরা সবাই চেষ্টা করলাম শত্রুকে দেখার। কিন্তু এত ঘন গাছের পাতার ভেতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

স্নাইপারও সম্ভবত আমাদের দেখতে পায়নি। আমরা নিঃশব্দে এসে তার একেবারে কোনাকুনি পজিশন নিয়েছি। স্নাইপার তখন সামনে তাকিয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্নাইপার বাইনোকুলারে ধরা পড়ল। এলএমজির নিশানা লাগিয়ে পরপর দুবার ট্যা-ট্যা করে ফায়ার করলাম। ধপ করে বটগাছের উঁচু ডাল থেকে গুলি লাগা স্নাইপার মাটিতে পড়ে গেল।

আমরা সামনে এগুতে থাকলাম। আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বৃহৎ এক মুক্তিবাহিনী দল।

কিছুদূর এগিয়ে থমকে গেছি। আশপাশে তাকালাম। সেই মেয়েটিকে খুঁজছি, যে আমাদের স্নাইপারের খোঁজ দিয়ে চরখাইয়ের পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে। তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। তার নাম জানা হয়নি। তার কাছে আমাদের কত কৃতজ্ঞতা, সেকথা বলা হয়নি। সেই কিশোরী দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে।

অসীম সাহসী একজন কিশোরী মুক্তিযোদ্ধা আমাদের কাছে অজানা থেকে গেল।

আমার চোখ জ্বালা করছে। খুব কান্না পাচ্ছে। আমার নামে সেই মেয়েটির নাম দিলাম শ্রাবণী। আমি ক্লাস এইটে পড়ি। সেই মেয়েটিও কি তখন ক্লাস এইটে পড়ত? দাদাকে দেখিনি। দাদার ছবি দেখেছি আর তাঁর কথা শুনেছি। আজকের এই দিনে কেন জানি দাদার জন্য আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। দাদার মৃত্যুদিন। যিনি দেশ স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। বাড়ি থেকে অনেক দূরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের পাশে দাদার কবর দেওয়া হয়েছে। এখনো সেখানেই আছে। মাঝেমধ্যে আমরা যাই। আজ থেকে দাদার কাছে সেদিনের সেই অজানা মেয়ে আমি শ্রাবণী হয়ে রইলাম। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

রঙিন আলোর ফোয়ারা

নাসীমুল বারী

মোবাইলটা সামনে তুলে ধরে রাকিব সুমনকে বলে, দেখ সুখী দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা!

আগ্রহে রাকিবের মোবাইলটা হাতে নিয়ে তালিকা দেখতে দেখতে বলে, আমাদের দেশের নামটা কত নাম্বরে?

-না রে, আমাদের দেশের নাম নেই।

-নেই...! তার মানে আমাদের দেশ অসুখী দেশ?

-আচ্ছা তুই বল, সুখী দেশ হলে ওরা তালিকায় বাংলাদেশের নাম রাখত না?

-বটে।

সুখী দেশ, পরিচ্ছন্ন দেশ, নিরাপদ দেশ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা প্রায় ক্রমতালিকা প্রকাশ করে। হয়ত এসব তালিকায় একটি দেশের সাধারণ মানুষের ওপর বড়ো কোনো প্রভাব ফেলে না; কিন্তু তারপরও এসব তালিকায় একটি দেশের মানসিক প্রশান্তি থাকে।

রাকিবের এসব তালিকা দেখতে ও জানতে ভালো লাগে। তাই খুঁজে খুঁজে এসব খবরাখবর বের করে বন্ধুদের দেখায়। এসব ইতিবাচক সুন্দর খবরগুলোতে

যদিও নিজের প্রিয় দেশ বাংলাদেশের নাম থাকে না বললেই চলে। তবু এমন খবরাখবরে আগ্রহ এবং কৌতূহলের সাথে সাথে একটা কষ্টও থাকে রাকিবের মনে।

আজও মনটা খারাপ।

সুমনকে খবরটা দেখিয়ে রাকিব বলে, আমাদের কপালটা কি মন্দ! সুখী দেশের মানুষ হতে পারলাম না আমরা।

-হ্যাঁ, তাই তো দেখছি খবরটায়।

-কেন জানিস?

-কেন?

-আমরা আমাদের দেশটাকে ভালোবাসি না। আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই। দেশের প্রতি মায়া, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা নেই। দেশের নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধা পরিপালনের ইচ্ছা নেই বললেই চলে। অনিয়মই আমাদের দেশে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্রিকাগুলোর খবর দেখ, কত অনিয়মের খবর অহরহ প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ বিদেশি যে-কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের আগ্রহটা একটু বেশি। একটা ঘটনা শোন।

গতকাল আব্বাকে নিয়ে নিউমার্কেট গিয়েছিলাম প্যান্টের কাপড় কিনতে। আমি দোকানিকে বলি, 'বাংলাদেশে তৈরি কোনো প্যান্টের কাপড় দেখান তো।' দোকানি আমাদেরকে বিভিন্ন দেশের প্যান্টের কাপড় দেখাচ্ছে। আমি আবার বললাম, আমাদেরকে বাংলাদেশের কাপড় দেখান। দোকানি একটু অবজ্ঞার ঢঙ্গে মুচকি হেসে বলল, 'বাংলা মাল বিক্রি করি না।'

সুমন পিক করে হেসে দেয়। হাসি নিয়ে বলে বাংলা মাল দেশি মাল। ওটা তো আর বিদেশির মতো অত ভালো হবে না। সত্য কথাই তো বলেছে দোকানি।

-এই যে তুইও তো দেখি একই পথের পথিক। বাংলাদেশি পণ্য হলেই যে খারাপ হবে, আর খারাপ পণ্যকে 'বাংলা মাল' বলব এটা কেমন কথা! তার মানে 'বাংলা' নিকৃষ্ট কিংবা খারাপের প্রতিশব্দ ? তোর কী মনে হয় ?

সুমন বলে, ঠিকই রে! আমাদের সমাজে খারাপ কিছুকে 'বাংলা মাল' বলা একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে।

রাকিব সুমনের কাঁধে হাত রেখে বলে, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। আর এ দুটো নিয়ে আমাদের জীবন। আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের উত্তর পুরুষ সবার জন্যই বাংলা। ভারতীয় সভ্যতায় একমাত্র বাংলা ভাষাই নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। বাংলার এত মাহাত্ম্য, মহত্ত্বকে আমরা কত নীচু ও কত খারাপ করে তুলেছি। এ বাংলাকেই আমরা কত অবজ্ঞা করি! কত অবহেলা করি! তাহলে ৫৩ বছর আগে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল কেন আমাদের বাপ-দাদারা?

সুমন কোনো কথা বলে না।

এতক্ষণ মাঠের এক কোণে বসে এসব কথা বলছিল ওরা দু'জন। আজ বিকেলে ওরা মাঠে এসেছে; কিন্তু খেলতে নামেনি। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে বাংলাদেশ দুই খেলায় হেরে বিদায় নিয়েছে, তাই মনটা খারাপ ওদের।

ওরা উঠে দাঁড়ায়। বাসায় ফিরবে। ওরা দুজনে স্কুলেরও বন্ধু পাড়ারও বন্ধু। একই স্কুলে, একই সাথে পড়ে ওরা দুজন। ধীরে ধীরে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে সুমন বলে, এই যে দেখ ক্রিকেট খেলা- এতেও কতজন আমাদের দেশকে সমর্থন করে? আমাদের ক্লাসের অনেক বন্ধুই বাংলাদেশ বাদ দিয়ে অন্য দেশের ভক্ত।

রাকিব শান্ত কণ্ঠে বলে, তুই তাহলে বুঝতে পেরেছিস?

সুমন মাথাটা একটু নেড়ে হাঁটছে। রাকিব আবার বলে, পত্রিকাতে প্রতিদিন দেখি আমাদের শিল্পপতি, মন্ত্রী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা দেশের টাকা পাচার করে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি বানাচ্ছে। এক মন্ত্রীরই নাকি চার-পাঁচশ বাড়ি আছে বিদেশে। এদিকে আবার এ পাড়ার,

ও পাড়ার অনেককেই দেখি ঈদের কেনাকাটা করতে আশপাশের দেশগুলোতে যাচ্ছে। কেন আমাদের দেশে কি কেনাকাটার জায়গা নেই?

জেন জি প্রজন্মের রাকিব, সুমন। সময়ের সাথে সমান গতিতে চলে ওরা। তাই দেশ দুনিয়ার সব খবরই ওদের হাতের মুঠোয়। নিজ দেশ, দেশের অনিয়ম বিশৃঙ্খলার সাথে বিভিন্ন দেশের তুলনা করতে শিখেছে।

হাঁটতে হাঁটতে রাকিব বলে, আর কদিন পরে আমাদের দেশের স্বাধীনতা দিবস।

সুমন বলে, আমি আমার দাদুর মুখে শুনেছি উনারা ছোটোবেলায় স্বাধীনতা দিবসে পাড়ায় পাড়ায় মাঠে মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতেন। নাটক করতেন। আরো কত কী!

-হ্যাঁ, আমিও এমন শুনেছি বাবার কাছে। সে সব তো ৪০-৫০ বছর আগের কথা। আমাদের বাবা-দাদারা করতেন। সকাল থেকে রাত অব্দি থাকত সেসব আনন্দ আয়োজনে প্রাণের টান।

আজ থেকে ভালোর প্রতিশব্দই বাংলা। ভালোবাসার অনুভবই বাংলা। বাংলাদেশই আমার অস্তিত্ব, আমার ভালোবাসা। বাংলা মালই সেরা পণ্য।

রাকিবও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, বাংলা আমার স্বাধীনতা। বাংলা আমার দেশ। বাংলাদেশ আমার আনন্দ, রঙিন আলোর ফোয়ারা। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

রুম্পা ও পরিবন্ধু

সনজিত দে

রুম্পা একটি ফুলের কলি ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই কে যেন বলে উঠল রুম্পা তুমি এ কী করলে? রুম্পা চমকে ওঠে, কে কে আমাকে নাম ধরে ডাকে? এদিকে ওদিকে চতুর্দিকে দেখে। না কোথাও কেউ নেই।

থতোমতো হয়ে সাহস নিয়ে বলে কে? কে ডাকছ আমাকে এমন করে?

আমি ফুলপরি।

কোন ফুলপরি? তোমাকে তো আমি চিনি না।

চিনবে কী করে, আমি কী তোমাদের গ্রামে থাকি?

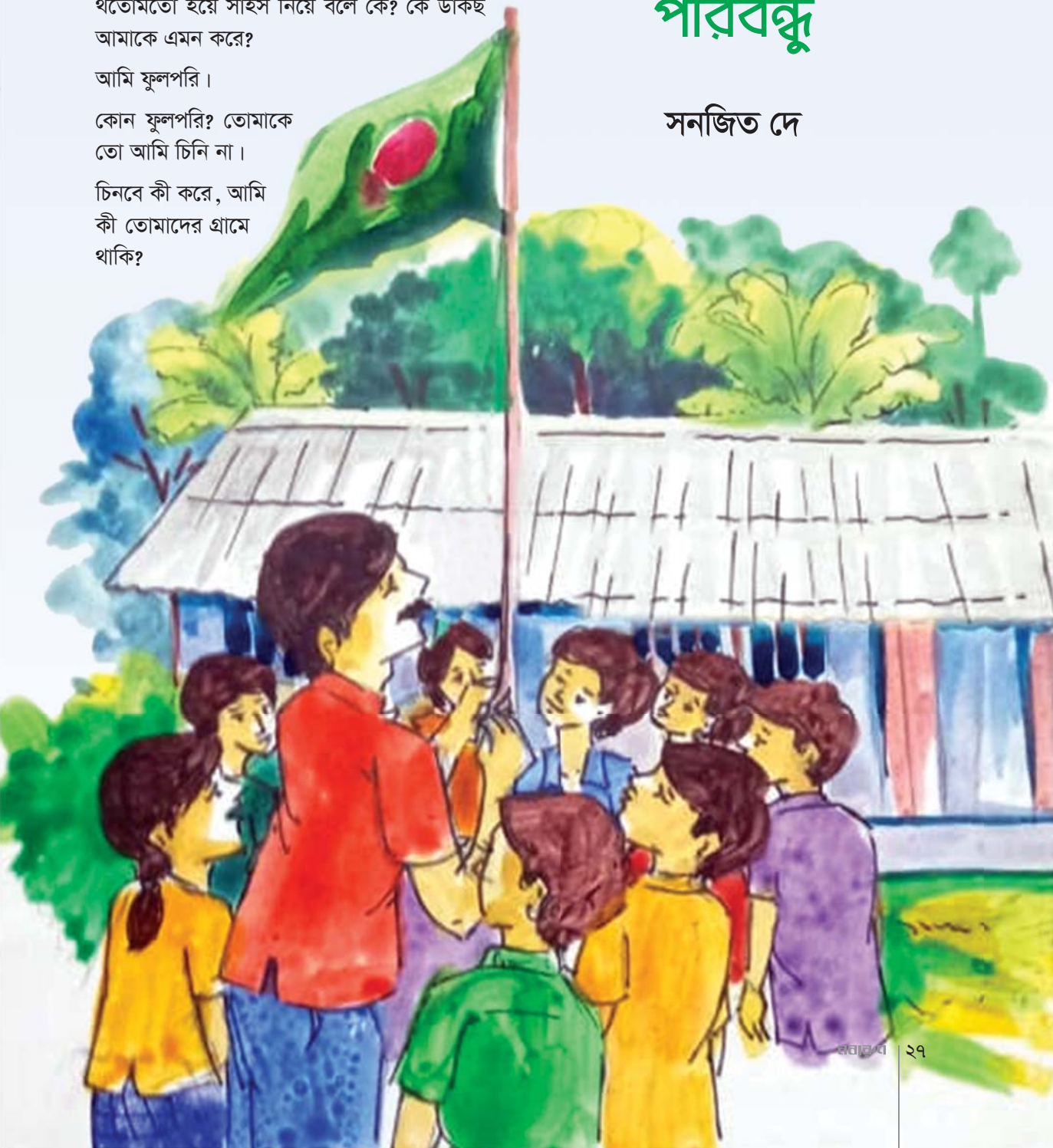

তাহলে, তাহলে তুমি কোথায় থাকো ?

আমি থাকি ওই দূর আকাশে। পরির রাজ্যে।

তোমাকে তো আমি দেখছি না।

আমরা নিজ থেকে দেখা না দিলে কেউ আমাদের দেখতে পায় না। তুমি কি আমাকে দেখতে চাও ?

হ্যাঁ চাই। যার সাথে কথা বলছি অথচ তাকে দেখছি না তা কী হয় ?

মুহূর্তে ফুলপরি শোঁ শোঁ শব্দ করে রুম্পার সামনে দাঁড়ায়।

বাহ্ তুমি তো খুব সুন্দর।
তুমিও বুঝি কম সুন্দর ?

আচ্ছা ফুলপরি, আমি খেলব বলে একটি কলি ছিঁড়েছি তাও আমাদের বাগান থেকে কিন্তু তুমি আমাকে ওভাবে ধমক দিয়েছ কেন ?

আমি তোমাকে ঠিক ধমক দেইনি রুম্পা। একটি ফুল তখনই ছিঁড়তে পারো, যখন কলি থেকে ফুল ফুটবে। কলি তো ফুল হওয়ার আগে তুমি ছিঁড়ে ফেললে, ওকে আর ফুল হতে দাওনি। আর একটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার। ফুল শুধু নিজের জন্য ফোটে না। এটা আমাদের কথা না। এটা তোমাদের দার্শনিকেরা লিখেছেন। আর আমরা তোমাদের বাগানের পরিচর্যা করি বলে তোমাদের বাগান ফুলে ফুলে ভরে থাকে।

ঠিক আছে ফুলপরি। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম আজ। আসলে আমি জানতাম না। কলি ছেঁড়া উচিত নয়।

ঠিক আছে রুম্পা। কেউ যদি তার ভুল কাজের জন্য অনুতপ্ত হয় এমনিতেই তা আর দোষ থাকে না। তুমি না জেনে ফুলের কলি ছিঁড়েছ তাই না। আমরাও না জেনে কত ভুল করি। না জেনে ভুল করলে তার তেমন দোষ থাকে না। তুমি তোমার ভুল বুঝেছ তোমার আর কোনো দোষ রইল না।

শান্তি পেলাম ফুলপরি। আজ থেকে একটি কলিও কাউকে ছিঁড়তে দেব না। আমিও ছিঁড়ব না।

আচ্ছা ফুলপরি তোমার সঙ্গে আমার আবার কখন দেখা হবে ?

তুমি যখন চাও তখন।

কীভাবে ?

তুমি এই ছড়াটা কাটবে—

আয়রে পরি আয় রে সই
বাগান বাড়ি আয়
ফুলে ফুলে ভরে আছে
আমার বাগিচায়।

তখনি আমি ছুটে আসব। তবে তোমাকে কথা দিতে হবে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় এ কথা ভুলেও কাউকে বলবে না। বললে হাজার বার ছড়া কাটলেও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

ঠিক আছে ফুলপরি।
এবার তাহলে আসি রুম্পা?
এসো ফুলপরি। ভালো থেকো।

তুমিও ভালো থেকো রুম্পা বলে মূহুর্তে আবার ফুলপরি চলে গেল পরির রাজ্যে।

ফুলপরি চলে গেল। রুম্পা তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আহা কিছুটা সময় হলেও আজকের দিনের শুরুটা অন্যরকম ভালো লাগলো রুম্পার। রুম্পা ভাবছে ফুলপরি তো কথা দিয়েছে যখনি আমি ছড়াটা কাটব তখনি ফুলপরি এসে উপস্থিত হবে। তবে তাকে সবসময় ডাকা উচিত হবে না। ফুলপরি বলেছে তার সঙ্গে দেখা হয় কেউ যদি জেনে যায় ফুলপরি কখনো আর দেখা দেবে না। তাই রুম্পা সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধু ছুটির দিনে ফুলপরিকে ডাকব। সেদিন চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

তিনদিন পর ফুলপরি নিজেই এল, পেছন থেকে রুম্পা বলে ডাকতে না ডাকতে রুম্পা বলে, এসেছ ফুলপরি ?

হ্যাঁ তোমার কথা মনে হতে না হতেই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি।

তুমি এসেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি।

কিন্তু তুমি তো আমায় স্মরণ করোনি রুম্পা ?

ফুলপরি, আমি ভেবে রেখেছি তোমার সঙ্গে প্রতিদিন খেলতে বের হলে হয়ত মা-বাবার হাতে ধরা পড়ে যাব। তাই তোমার আমার বন্ধুত্বকে টিকিয়ে রাখতে শুধু বন্ধের দিনে তোমার ছড়াটি কেটে তোমার সঙ্গে বেড়াবো।

তুমি তো বড়ো বুদ্ধিমান মেয়ে ?

বুদ্ধিমান কি না জানি না।

চলো রুম্পা তোমাদের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখব।

দেখাবে না।

অবশ্যই দেখাবো, চলো।

দেখো ফুলপরি, ওই যে হলুদ বিল্ডিং দেখা যায় ওটা আমাদের স্কুল। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে স্কুল। থেকে বাড়ি ফিরে এলাম।

তোমাদের স্কুলটা খুব সুন্দর। আচ্ছা রুম্পা, ওই যে স্কুলের সামনে একটা বাসের মাথায় কী একটা বাতাসে উড়ছে ওটা, ওটা কী ?

ওটা আমাদের জাতীয় পতাকা। এই পতাকা আমাদের প্রাণ। আমাদের সম্মান। এই পতাকা আমাদের ইতিহাস।

আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে এই পতাকার ইতিহাস জানতে। তুমি আমাকে শোনাবে ? এই জাতীয় পতাকার ইতিহাস।

ইতিহাস মানে বিশাল। আমি সংক্ষেপে তোমাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করব। চলো, আমরা ওখানটাতে বসি।

এই যে দেখছ আজকের বাংলাদেশ। এই দেশ একসময় বিশাল ভারতবর্ষ ছিল। এই ভারতবর্ষকে তখন শাসন করতো ইংরেজরা। ইংরেজদের শাসন ছিল আমাদের ওপর অন্যায় ও অবিচারের। তারা আমাদের মানুষ ভাবতো না। আমরা ছিলাম তাদের হাতের পুতুল। তারা আমাদের সারা জীবন দাস বানিয়ে রেখেছিল। অনেক আন্দোলনের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি দেশের জন্ম হয়। পর দিন জন্ম নেয় ভারত নামে আরেকটি দেশ।

ইংরেজ থেকে ভাগ হয়ে দুটি দেশের জন্ম হলো। কিন্তু আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হলো না। আমরা ঝুলে রয়ে গেলাম পাকিস্তানের সঙ্গে।

ঝুলে মানে বুঝলাম না রুম্পা।

ঝুলে মানে হলো। আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে রয়ে গেলাম।

বুঝলাম কিন্তু সমস্যা কী ?

সমস্যা হলো। ওরা পশ্চিম পাকিস্তান আর আমরা পূর্ব পাকিস্তান। মাঝখানে ভারত নামে বিশাল এক দেশ। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান দুটি আলাদা ভূখণ্ড। এ পাকিস্তান থেকে ওই পাকিস্তান যেতে হলে জলপথ, স্থলপথ, উড়োপথে ভারতের উপর দিয়ে যেতে হত।

তারপর-তারপর কী হলো ?

তারপরের অবস্থা আরও করুণ। পশ্চিম পাকিস্তান ইংরেজদের থেকেও কঠোর হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য ওখানে নিয়ে যায়। আমাদের তৈরি পণ্য দ্বিগুণ দামে আমাদের কিনতে হতো। শুধু তাই নয়, কথায় কথায় তারা আমাদের পায়ে শিকল পরায়। অন্যায় জেল-জুলুমে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। কোনোরকমে তারা আমাদের দমাতে পারেনি।

তারপর কী হলো ?

তারপর তারা আমাদের ভাষাটাকে কেড়ে নেওয়ার পায়তারা করেছে। ঘোষণা করে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। বাঙালিরা এবার আর চুপ করে থাকতে পারে না। প্রাণ দিতে রাজপথে নেমে পড়ে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা মানবে না। অনেক রক্ত ঝরেছে এই মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্য। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষাকে হৃদয়ে লালন করে বাঙালিরা প্রথম যুদ্ধে জয়ী হলো। বিশ্বে একমাত্র জাতি আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি, অকাতরে প্রাণ দিয়েছি।

এইসব কাহিনি বলে শেষ করা যাবে না।

রুম্পা স্বাধীনতা, জাতীয় পতাকা কীভাবে পেলে সেটা তো বললে না। একটু সংক্ষেপে যদি বল ?

সে অনেক কথা। বলি, তাহলে শোনো। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে ঘুমিয়ে থাকা বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে দেয় বাঙালিদের ঘরবাড়ি। পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় বাঙালিরাও তখন পালটা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে আমাদের ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছে।

রুম্পা, তোমাদের ইতিহাস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। তোমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনে তোমাদের বাঙালি জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে যায়।

এসো এই মহান জাতির জাতীয় পতাকা তলে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি।

রুম্পা বলে, আমাদের একটা জাতীয় সংগীত আছে। এই পতাকা তলে আমরা সমবেত হয়ে জাতীয় সংগীত গাই।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...

রুম্পা, এবার তাহলে আমাকে বিদায় দাও ? আমি আজ একটি ইতিহাস নিয়ে যাচ্ছি পৃথিবী থেকে।

এসো ফুলপরি।

ফুলপরি মুহূর্তে চলে গেল শোঁ শোঁ শব্দ করে তাদের দেশে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

সামনে নতুন দিন

ইউনুস আহমেদ

দ্রিম! দ্রিম! দ্রিম! কয়েকটা গুলির শব্দ। নিরবতা খান খান হয়ে চারদিক কেঁপে ওঠল। থমকে দাঁড়াল সজল। একাত্তরের যুদ্ধ কি তাহলে তাদের গ্রামেও চলে এল? হাট থেকে ফিরছিল সে। হঠাৎ দেখতে পেল বড়ো রাস্তার পাড় বেয়ে কে যেন গড়িয়ে পড়ল নিচে। দূরে দেখল হানাদার পাক মিলিটারির লোকজন দৌড়ে আসছে। নিমিষেই বুঝে ফেলল সে। মুক্তিবাহিনিকে তাড়া

করছে একদল হানাদার। হাতের জিনিস ফেলে দিয়ে লোকটার দিকে দৌড়াল সে। রাস্তা থেকে ঢালুতে নেমে পড়ল। হানাদাররা রাস্তার ঐ পাড়ে। তাই আড়াল থাকতেই লোকটাকে সরাতে হবে। কাছে যেতেই দেখতে পেল লোকটার পা থেকে রক্ত ঝরছে। হঠাৎই যেন সজলের শরীরে বিপুল শক্তি ভর করল। কিশোর সজল তার চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড়ো মুক্তিযোদ্ধাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর নিচু হয়ে জমির আইলের ওপর দিয়ে দৌড় দিল। জমি শেষেই ছোটো-বড়ো ঝোপঝাড় সেদিকেই দৌড়াচ্ছে সজল। একবার ঝোঁপে ঢুকতে পারলে তাকে আর পায় কে? কারণ এরপরেই বিশাল জঙ্গল। ঝোপে ঢুকেই একটু থামল সজল। নিচু হয়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেলল। হায়েনাগুলো ততক্ষণে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিকে খুঁজছে। হঠাৎ মুক্তির উধাও হয়ে যাওয়ায় তারা যেন খুব অবাক হচ্ছে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। এরমধ্যে একজন ঝোঁপের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। সজলের বুক ঢিব ঢিব করছে। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। দ্রুত আরও ঘন ঝোপের দিকে সরে যেতে লাগল। এ তল্লাট তার হাতের তালুর মতনই মুখস্ত। হায়েনাদের চিৎকারের শব্দ পেল। কয়েক রাউন্ড গুলিও ধেয়ে এল। সজলের ঠিক কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। একটুকু সময় নষ্ট করা যাবে না। অসুরের শক্তি যেন ভর করেছে সজলের গায়ে, তাকে পারতেই হবে। এই মুক্তিকে তার বাঁচাতেই হবে। ঝোপ ছেড়ে গভীর বনে ঢুকে পড়ল সে। এখন আর তাকে পায় কে?

জলছায়া বনে এর আগেও আরও কয়েকবার আসা হয়েছে সজলের। দুরন্ত স্বভাবের সজলের শখ বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো। সে একাই ঘুরতে পছন্দ করে। এই জলছায়া বনে তাদের আর খুঁজে পাবে না হায়েনাদের দল। সামনেই দেখা যাচ্ছে তরু চাচার কুটির। সেখানে নিতে পারলে এই মুক্তিবাহিনির লোকটিকে হয়ত বাঁচানো যাবে। কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছুতেই তরু কাকা দেখতে পেল। দৌড়ে এসে ধরে ফেলল আহত মুক্তিকে। তারপর নিয়ে চলল কুটিরের বারান্দায়। চৌকিতে শুইয়ে দিলো। হুঁশ নেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধার। ভেতর থেকে পানি এনে ছিটা দিতে লাগল তরুণের মুখে। খানিক পর হুঁশ ফিরল তার। মুখের সামনে পানির গ্লাস ধরতেই ঢকঢক করে পানিটুকু শেষ করল তরুণ। একটু যেন শক্তি ফিরে পেল সে। পায়ের দিকে তাকালো পট্টিবাধা। সজল ওর গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে সেটা দিয়ে পট্টি বেঁধে দিয়েছে। 'তোমাকে ধন্যবাদ, ভাই' বলে সজলের সাথে হাত মেলালো।

: ওকে এক্ষুণি ডাক্তার দেখানো দরকার।

: কিন্তু হায়েনারা আশপাশেই আছে। বের হলেই ধরে ফেলবে।

: বনের ওপাশেই অনিল খুঁড়োর বাড়ি। আমি যাচ্ছি তাকে আনতে।

: ঠিক আছে যা, তবে খুব সাবধানে।

: তুমি চিন্তা করো না তরু চাচা। আমি সাবধানেই যাবো। এ তল্লাট আমার চেনা।

বলেই কুটির থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সজল।

একটা গরম খবর নিয়ে ফিরল সজল। ঔষধ আনতে বটতলির হাটে গিয়েছিল সজল। দেখেছে হাটের সবার মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। হাটের অদূরেই আস্তানা গেড়েছে হায়েনার দল। সজলের মুখ থেকে এসব শোনার পর তরুণ মুক্তির চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। অনিল খুঁড়োর চিকিৎসার পর তরু কাকা আর সজলের সেবায় কয়েকদিনেই বেশ সেরে উঠল তরুণ মুক্তি। তরুণের নাম রাফাত। রাজধানী ঢাকা শহরে তার বাসা। দেশমাতৃকার ডাকে শহরের আরাম আয়েশের বাসা ছেড়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই কয়দিনেই সজলের সাথে আরও ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে রাফাতের।

: রাফাত ভাইয়া, হায়েনার দল বটতলী হাটের অদূরে আস্তানা গেড়েছে।

: তাহলে তো সবার জন্যই বিপদ। ওরা সব জ্বালিয়ে

দেবে। মানুষ মারবে।

: এখন উপায়?

: উপায় আছে। আমার গেরিলা দল খুব শিগগিরই এসে পড়বে। তারপর বুঝবে হায়েনার দল।

: আমরা যে এখানে আছি তা কি তোমার দল জানে ?

: না জানলেও খুঁজে বের করে ফেলবে। আর খুঁজে না পেলে আমিই ওদের খুঁজে বের করে ফেলব। তার আগে একটা কাজ করতে হবে।

: কী কাজ রাফাত ভাইয়া?

: কাজটা খুব সাহসী কাজ।

: ওদের আস্তানার খুব কাছে থেকে সব দেখে আসতে হবে। তারপর আমরা প্ল্যান করব কীভাবে ওদের আক্রমণ করা যায়। নষ্ট করার মতো সময় নেই সজলের হাতে। পরদিনই সে বেরিয়ে পড়ল রেকি করতে। রাখাল বালক সেজে হায়েনাদের আস্তানার একদম কাছে চলে গেল। দেখল মোট পাঁচটা তাঁবু। খুঁটিয়ে দেখল সবকিছু। তারপর এসে রাফাত ভাইকে সব বলল। রাফাত ভাই টুকরো কাগজে পেনসিল দিয়ে একটা নকশা এঁকে ফেলল। তারপর বিদায় নিলো ওদের কাছ থেকে। বিদায়ের সময় রাফাত ভাই সজলকে বুকে জড়িয়ে নিলো। বলল- সজল, সামনে আমাদের নতুন দিন। সেই দিনটি আনতে আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছি। নতুন দিন এনেই তবে আমরা ঘরে ফিরব। আমাদের এই নতুন দিন আনার যুদ্ধে তোমাদের সহযোগিতা আমাদের অনেক সাহস যোগায়। তোমরা আমাদের পাশে থাকলে পাকি হায়েনাদের পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করতে পারব। রাফাত ভাই বিদায় নিয়ে জঙ্গলের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঠিক তিনদিন পরের এক ভোরবেলায় প্রচণ্ড গুলাগুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। বটতলী হাটের অদূরে সেই পাকিদের আস্তানায় যেন কিয়ামত নেমে এল। রাফাত বাহিনী আক্রমণ করেছে সেখানে। কয়েকজন পাকি হায়েনা মারা গেল আর বাকিরা বন্দি হলো। সজল নিশ্চিত হলো যে এইভাবে মুক্তিবাহিনীই আমাদের নতুন দিন এনে দিতে পারবে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও শিক্ষক

মায়ের মতো দেশ

তামিম আল হাদী

দেশটাকে ভাই ভালোবাসি
আমি কত,
দুইটি শব্দে জবাব দিলাম
মায়ের মতো।

মায়ের ছবি গাঁয়ের ছবি
বুকে রাখি,
দেশকে আমি ভালোবেসে
ভালো থাকি।

আমায় দেখে বলবে সবাই
ধন্য ধন্য,
এমন কিছু করব আমি
দেশের জন্য।

দাদুর পতাকা

শাকিব হুসাইন

রাত দশটা। দাদু সদ্যই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছে। দাদুর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর কথা। আজকে একটু দেরি করে ফেলেছে। সে যাকগে, আমার মিশন আজকে সফল করতেই হবে।

কীসের মিশন? পাঠক সমাজকে অবগত করছি শেষমেষ।

মিশনটা হচ্ছে এই যে, দাদুর ঘরে একটা আলমিরা আছে। পুরাতন কিন্তু সোনালি রঙের আলমিরাটার সৌন্দর্য এখনও উজ্জ্বল। বাসার সবাই আলমিরাটা অনেকবার খুলতে গিয়েছিল কিন্তু কেউ সফল হতে পারেনি। সবার ধারণা আলমিরার ভিতরে কোনো মহামূল্যবান কিছু একটা আছে। তাই আজকে চুপিচুপি আলমিরাটার কাছে গিয়ে যেই খুলতে যাব অমনি পিছন থেকে দাদু বলে উঠলেন, রনি আমি এখনো জেগে আছি রে। আলমিরা খোলার বৃথা চেষ্টা করিস না।

যা বাব্বাহ্, আমিও ধরা খেয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে দাদুর কাছে গেলাম। দাদু পাশে বসতে বললেন। আর বললেন, ওই আলমিরা তোরা খোলার চেষ্টা করলেও খুলতে পারবি না। ওই আলমিরার কাছে কেউ গেলেই যে আমার মনের মাঝে তোলপাড় চলে রে দাদুভাই। মনে হয় আমার এতদিনের আগলে রাখা সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি দাদুকে স্নেহভরা কণ্ঠে বলি, দাদু ওই আলমিরাটায় কী এমন মহামূল্যবান বস্তু আছে বলো তো?

দাদু একটু রাগান্বিত ভঙ্গিতে বললেন, শুধুই মহামূল্যবান না রে। আমার দেশটা আছে ওখানে। ওই আলমিরাতে আমার পুরো দেশটা চোখ বুঝে ঘুমোচ্ছে রে দাদুভাই।

দাদু আর কিছু বললেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন তক্ষুণি। আমিও আর কোনোদিন আলমিরার ধারের কাছেও যাইনি।

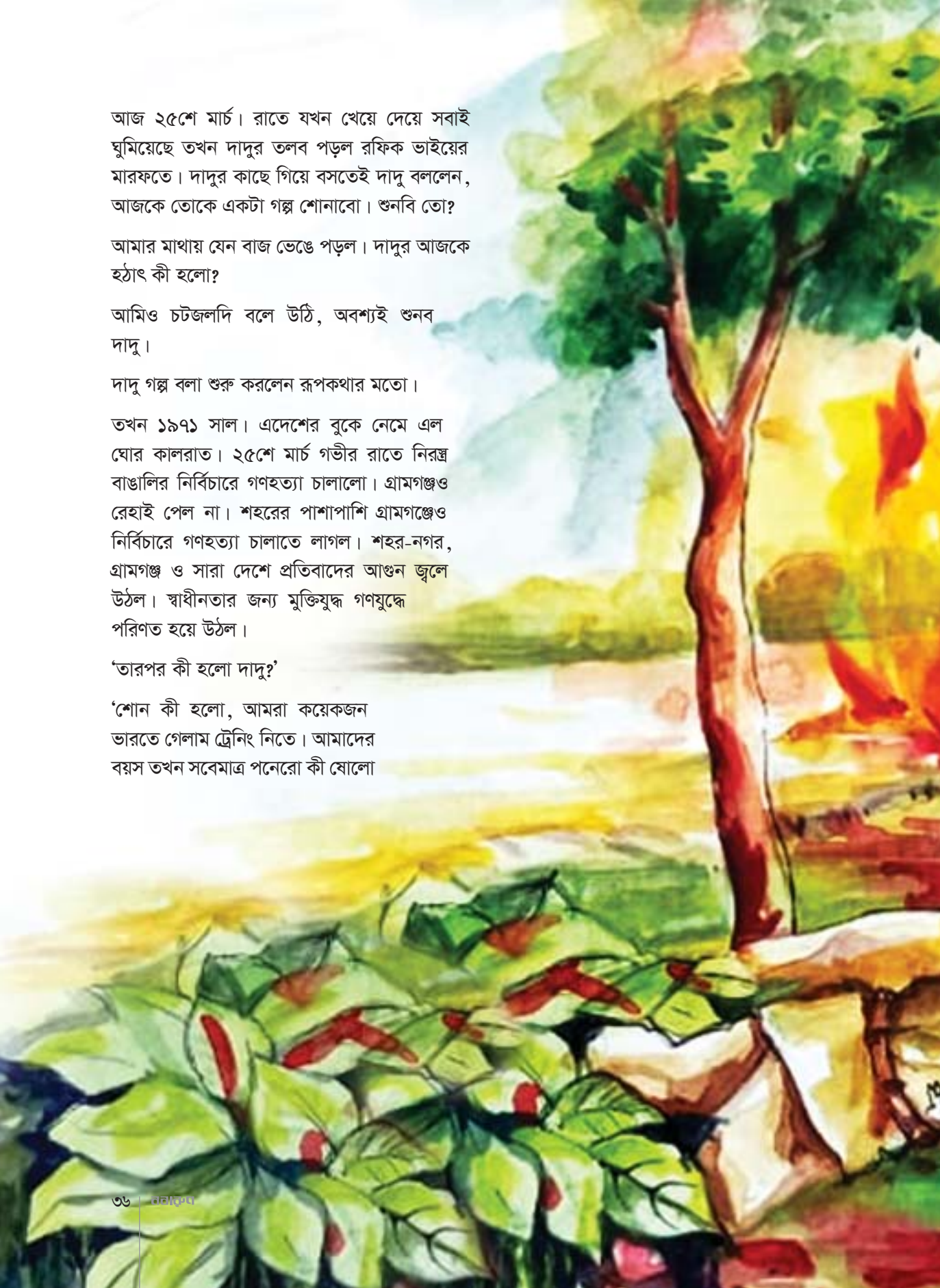

আজ ২৫শে মার্চ। রাতে যখন খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমিয়েছে তখন দাদুর তলব পড়ল রফিক ভাইয়ের মারফতে। দাদুর কাছে গিয়ে বসতেই দাদু বললেন, আজকে তোকে একটা গল্প শোনাবো। শুনবি তো?

আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। দাদুর আজকে হঠাৎ কী হলো?

আমিও চটজলদি বলে উঠি, অবশ্যই শুনব দাদু।

দাদু গল্প বলা শুরু করলেন রূপকথার মতো।

তখন ১৯৭১ সাল। এদেশের বুকে নেমে এল ঘোর কালরাত। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে নিরস্ত্র বাঙালির নির্বিচারে গণহত্যা চালালো। গ্রামগঞ্জও রেহাই পেল না। শহরের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জেও নির্বিচারে গণহত্যা চালাতে লাগল। শহর-নগর, গ্রামগঞ্জ ও সারা দেশে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠল। স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ গণযুদ্ধে পরিণত হয়ে উঠল।

'তারপর কী হলো দাদু?'

'শোন কী হলো, আমরা কয়েকজন ভারতে গেলাম ট্রেনিং নিতে। আমাদের বয়স তখন সবেমাত্র পনেরো কী ষোলো

হবে। সেই বয়সে আমরা চুপ থাকতে পারিনি। মাথা গরম তো। দেশের মানুষকে খুন করলে রক্ত বিগড়ে যায়। ট্রেনিং থেকে এসে দমাদম মিলিটারি মারতে লাগলাম। অবশেষে দীর্ঘ ন'মাস লড়াই করে ত্রিশ লক্ষ শহিদ, আড়াই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম আর নাম না জানা অসংখ্য শহিদের বিনিময়ে পেলাম স্বাধীন এই দেশ। বাংলাদেশ! পেলাম লাল-সবুজের পতাকা। আমার দেশের পতাকা। শহিদের রক্তের পতাকা। আকাশে তখন পতপত করে উড়ছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকা।

আচ্ছা যা, আলমিরাটা খোল।'

আমি তো রীতিমতো অবাক। হঠাৎ দাদু আলমিরা খুলতে বলছেন। তা-ও আবার আমাকে। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

আলমিরা খুলতেই একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকে ভেসে উঠল। অনেকদিনের পুরনো তো। এই তো আলমিরার ভেতরে লাল-সবুজের মানচিত্র খচিত পতাকা। এর বাইরে আলমিরাতে আর কিছুই নেই। দাদুর কাছে নিয়ে যেতেই বললেন, এই জিনিসই আমার মহামূল্যবান বস্তুর দাদুভাই। এই পতাকাই আমার স্বাধীন বাংলাদেশ। জানিস দাদুভাই, এই পতাকা গায়ে জড়িয়ে আমি যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীনের পর এই পতাকা উড়িয়েছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আজ থেকে এই দুটো তোর। আগলে রাখিস দাদুভাই আমার দেশকে। আমার পতাকাকে।

আমি দাদুকে কথা দিই জীবনের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করব দাদুর পতাকা। ঘড়ির কাঁটায় রাত ১২ টা বেজে ১ মিনিট। দাদু ঘুমিয়ে গেলেন। সেই যে ঘুমালেন আর উঠলেন না। চলে গেলেন তাঁর লাখো শহিদ ভাইদের কাছে। আলমিরাটা এখন আমার ঘরে থাকে। দাদুর পতাকা এখনও আলমিরাতে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকে। ❑

গল্পকার

স্বাধীনতা

সুস্মিতা চৌধুরী

কল কল নদী,
ছুটে চলে নিরবধি।
পাখি গায় গান
হাসিখুশি প্রাণ।
ভয়হীন বুক,
মন ভরা সুখ।,
সুঁই-সুতোর নকশিকাঁথা
লক্ষ শহিদের বীরত্ব গাথা।
বিভীষিকাময় রাত
পেতেছিল ফাঁদ
নামল নীরবতা।
এর নাম স্বাধীনতা।

দ্বাদশ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প

ছায়ামানবের স্বাধীনতা যুদ্ধ

তৌসিফ হাসনাত আনান

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মার্চ মাস থেকেই। তবে এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শহর, গ্রাম, বন্দর সব জায়গায় লড়াই চলছে। সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়াও কিন্তু কিছু যুদ্ধ চলে নিঃশব্দে ও অন্ধকারে, যেখানে যোদ্ধাদের পরিচয় কেউ জানে না।

পুরান ঢাকার এক সরু লেনের পুরোনো দোতলা বাড়িতে থাকতেন জামশেদ সাহেব। তিনি পেশায় ছিলেন কলেজের শিক্ষক। কিন্তু ভয়াবহ এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তার কাজ কেবল শিক্ষার্থী পড়ানোতে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই শান্তশিষ্ট মানুষটি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের এক গোপন সংযোগ কেন্দ্রের পরিচালক। তার

বাড়ির নিচতলায় পুরোনো চায়ের দোকান ছিল, আর সেই দোকানই তৈরি হয়েছিল এক যোগাযোগ কেন্দ্রে। কিন্তু তার পরিচয় আর কতদিনই বা গোপন থাকে? ঢাকার রাজপথ তখন থমথমে। পত্রিকা আর রেডিওতে প্রতিদিন কারফিউ, তল্লাশির, খবর শোনা যায়। কিন্তু তার মাঝেই শহরের আনাচে-কানাচে কিছু মানুষ অদৃশ্য হয়ে যায়, আর মুক্তিবাহিনীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে যায়। এইসব তথ্য পৌঁছে দিত শওকত নামের এক কিশোর। সে ছিল জামশেদ সাহেবের ছাত্র, কিন্তু তখন সে ছিল তার ছায়া। রাতে যখন শহর নিঃশব্দ হয়ে যেত তখন সে বেরিয়ে পড়ত। কখনো শহরের পুরোনো দেয়ালে বার্তা লিখে আসত, কখনো বা রাস্তার ধারে কোনো ভিক্ষুকের ঝুড়িতে চিঠি রেখে যেত। কিন্তু কেউ জানত না, এই গোপন বার্তাগুলো কে দেয় আর কে বা নিয়ে যায়? সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে একদিন হঠাৎ করেই জামশেদ সাহেবের দোকানে এক অপরিচিত জওয়ান লোক এল। এসে বলল, 'স্যার, আমি মুক্তিযোদ্ধা। আপনার সাহায্য দরকার। আমাকে কিছু তথ্য দিতে হবে।'

জামশেদ সাহেব লোকটিকে ভালো করে দেখলেন। তার চোখে ছিল একটা কেমন যেন অস্থিরতার চকচকে ভাব।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি এখানে কার মাধ্যমে পৌঁছেছেন?'

লোকটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি রফিক কমান্ডারের দলের একজন। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

জামশেদ সাহেব জানতেন, রফিক কমান্ডার কখনো কাউকে সরাসরি পাঠান না। তার সন্দেহ হলো। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার জন্য খবর আছে। তবে আজ রাতে আসতে হবে।'

লোকটি সেখান থেকে চলে গেল, কিন্তু তার যাওয়ার পরপরই জামশেদ সাহেব শওকতকে ডাকলেন। তাকে বললেন, 'আজ রাত থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। শত্রুরা আমাদের খুঁজে পেয়েছে।' শওকত ভয়ে শিউরে উঠল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। রাত গভীর হলে শওকত বের হলো। সে জানত পাকবাহিনীর গুপ্তচররা এখন ঢাকার অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা তাকে যে-কোনো সময় ধরে নিয়ে যেতে পারে। শওকতের কাজ ছিল এক টুকরো কাগজ মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দেওয়া, যেখানে লেখা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানা ও ঠিকানা বদলানোর বার্তা। সে অনুমান করল আজ কেউ একজন তাকে অনুসরণ করছে। হঠাৎ করে পেছন থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শওকত দ্রুত বাঁ দিকে মোড় নিল, তারপর হঠাৎ অন্ধকার গলির একদম কোণে বসে পড়ল, ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। একজন লোক তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। মিলিটারি বুটের শব্দ! তার বুক ধুকধুক করে কেঁপে উঠল!

তার হাতে কাগজটা তখনও শক্ত করে ধরা। সে জানত, এই কাগজ যদি শত্রুর হাতে যায়, তবে মুক্তিযোদ্ধাদের দল ধ্বংস হয়ে যাবে। সাহস সঞ্চয় করে সে উল্টো দিকের পথ ধরে দৌড় দিল। কিন্তু শত্রুরা অপেক্ষা করছিল। দুজন লোক বেরিয়ে এল, তার পথ আটকে দিল। একজন চিৎকার করে উঠল, 'এই ছেলে দাঁড়া! তুই কার জন্য কাজ করিস?' সে পালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে ধরে ফেলল এক সৈনিক। পাকিস্তানি সৈনিক তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'এবার বল, কোথায় যাচ্ছিস?' কিন্তু জবাবে সে একদম চুপচাপ। একটা কষিয়ে থাপ্পর পড়ল গালে। 'তোর সাথে কি চিঠি আছে? সে কিছুই বলল না। সে দ্রুত মুখে কাগজটা টুকরো টুকরো করে ফেলল। সৈন্যরা রেগে গিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে বলল, 'তোর জীবন শেষ!'

ঠিক তখনই ! বিকট শব্দে একটা বিস্ফোরণ হলো।

একদল মুক্তিযোদ্ধা পাশের বাড়ির ছাদ থেকে গুলি চালাতে শুরু করল। পাক সেনারা দিশেহারা হয়ে গেল। গোলাগুলির এক পর্যায়ে কেউ একজন শওকতকে টেনে ছায়ার মধ্যে নিয়ে গেল।

'তুই ঠিক আছিস?' এমন প্রশ্নে সে চমকে গেল আর তাকিয়ে দেখল- জামশেদ সাহেব! সেই রাতেই মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় গেরিলা অপারেশন চালিয়ে শত্রুদের একটি বড়ো ঘাঁটি ধ্বংস করল। কিন্তু জামশেদ সাহেব জানতেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। তিনি শওকতের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোর কাজ আজকের জন্য শেষ। কিন্তু আমাদের যুদ্ধ কিন্তু এখনো চলছে। তুই কি ছায়াযোদ্ধা হয়ে চলতে রাজি?' শওকত হাসল, তার চোখে ভয় নেই, আছে শুধু ক্রোধের আগুন। জবাবে সে বলল, 'আমি কখনো থামব না, স্যার।'

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, শহর জুড়ে বিজয়ের উল্লাস চলছে। কিন্তু অজস্র মানুষের ভীড়ে শওকত দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। তার দুই চোখ খুঁজছে সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদিন গোপন বার্তাগুলো লুকিয়ে রাখা হতো জামশেদ সাহেবের কমান্ডে।

কিন্তু জামশেদ সাহেব আর নেই। যুদ্ধের এক রাতে তিনি ধরা পড়েছিলেন। তার পরদিন পাকবাহিনী তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। শওকত আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু তার ভেতরের আগুন নেভেনি। এ আগুন যেন কখনো নেভার নয় সে জানে, জামশেদ সাহেবের যুদ্ধ শুধু বন্দুকের নয়, তার যুদ্ধ হচ্ছে ছায়ার যুদ্ধ। আর ছায়ারা কখনো মরে না। তারা বেঁচে থাকে বাঙালির চেতনায়। ❑

দশম শ্রেণি, নওগাঁ কে.ডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

গল্প

স্বাধীনতার সুখ

শারমিন নাহার ঝর্ণা

প্রভাতে চারিদিক কিচিরমিচির পাখির কূজনে মুখরিত, মৃদু শীতল হওয়া বইছে।

সাবিহা ঘুম থেকে উঠে বাহিরে খোলা আকাশের নিচে এসে দুহাত মেলে দিয়ে গাইছে–

'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা আমরা তোমাদের ভুলবো না'।

সাবিহার মা বলে কী রে সোনা আজ এত ভোরে উঠে গান গাইছো?

আম্মু জানো না আজ যে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করো স্কুলে যেতে হবে আজ স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি স্বাধীনতার গান গাইব। মনে পরেছে সোনা আমি জলদি কাজ সেরে নিচ্ছি ততক্ষণে তুমি গানটা সুন্দর করে শিখে নাও, আর খাঁচার ময়না পাখিটাকে খেতে দাও।

সাবিহা ক্লাস ফাইভে পড়ে, শখ করে বাবা তাকে একটা ময়না পাখি এনে দিয়েছে, পড়ালেখা শেষ করে যে সময় পায় সেই সময়টুকু ময়নার সাথেই কাটে। ময়না একটু একটু কথা শিখেছে, সাবিহাকে বলে সাবি.. সাবি... সাবিহা খুব খুশি হয়। সাবিহা ময়নার কাছে আসে খাবার নিয়ে, খাবারটা খাওয়ার জন্য ময়না খাঁচার মধ্য লাফালাফি করছে। এত লাফালাফি করতে দেখে সাবিহা ভাবে আমি যদি এমন খাঁচায় বন্দি থাকতাম তবে আমারও কষ্ট হত। ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারতাম না, যখন ক্ষুধা লাগবে তখন খেতে পারতাম না। ময়নাকে তো আমি ভালোবাসি, আর ভালোবেসে তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। আমার যেমন ইচ্ছে করে বন্ধুদের সাথে খেলা করতে, তেমন ময়নারও তো ইচ্ছে করে বন্ধুদের সাথে নীল আকাশে ডানা মেলে ভেসে বেড়াতে। গাছের এ ডাল থেকে ওডালে নেচে বেড়াতে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকাচুরি খেলতে। আরো কত ইচ্ছে ওর মনে

সাবিহা আম্মুকে বলে আম্মু আজ স্বাধীনতা দিবস আর স্বাধীন জীবন সবার পছন্দ, পরাধীনতার শিকলে কেন ময়নাকে আবদ্ধ করে রাখব? আজ ময়নাকে স্বাধীন জীবনে ফিরিয়ে দিব ও যদি আমার বন্ধু হয় তাহলে ঠিক আমার কাছে ফিরে আসবে।

'খাঁচার দুয়ার দিলাম খুলে যাও ময়না পাখা মেলে, স্বাধীনতার সুখে হাসো, মুক্ত আকাশে মনের সুখে ভাসো'

সাবিহা অনুভব করে স্বাধীনতার মাঝে অপার সুখ, আনন্দে ভরে গেল আজ ময়নার বুক, সাবিহার নয়নে জল টলমল করছে এই জল কষ্টের নয় আনন্দের। ঠিক এমন করেই বুঝি আমারা মুক্ত হয়েছিলাম হানাদার বাহিনীদের নির্যাতন থেকে, রক্ত ঝরিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা, স্বাধীনতার সুখ। সেই সুখ আজও আমাদের মস্তিষ্কে সুখের স্মৃতি।

কিছুক্ষণ পর ময়না পাখিটা উড়ে এসে সাবিহার হাতে বসলো, সাবিহার দু'চোখে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ল। ❑

গল্পকার

স্বাধীনতা মানে

মো. জাবির আহমেদ

২৫শে মার্চ ১৯৭১
ভয়াল কালরাতে
ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকবাহিনী
ঘুমন্ত বাঙালির উপরে।

আপামর বীর বাঙালি
করল শুরু যুদ্ধ
জীবন দিল অকাতরে
তরুণ যুবক বৃদ্ধ

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে
স্বাধীন হলো প্রিয় দেশ
লাল-সবুজ পতাকা আকাশে
পতপত করে উড়ছে বেশ।

৮ম শ্রেণি, গভ. বয়েজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম।

গল্প

এক কিশোরের যুদ্ধ

তূয়া নূর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিল তারা। কলেজ পাড়ায় বাসা। যুদ্ধে শহর গরম হচ্ছে প্রতিদিন। সালেকের বাবা ঠিক করল তাদের গ্রামে দাদা বাড়িতে রেখে আসবে। এসে আবার কাজে যোগ দিবে। ট্রেন থামল একটা স্টেশনে। থেমেই আছে। ছাড়ার নাম নেই। প্লাটফর্মে রাইফেল কাঁধে পাকিস্তানি আর্মি। একটা একটা করে রেলের কামরা চেক করছে।

যাকে ইচ্ছে তাকে টেনে ট্রেন থেকে নামাচ্ছে। লাইন করে দাঁড় করাচ্ছে তাদের।

সালেকের বাবা বলল, আমি নিচে নেমে বিষয়টা দেখে আসি। সালেকের মা খপ করে হাতটা

ধরে সিটে বসায়ে দিয়ে বললেন, এখানে চুপ করে বসে থাকেন। খোঁজ নেবার দরকার নাই। যখন ছাড়ার সময় হয় ট্রেন ছাড়বে। না ছাড়লে না ছাড়বে। নিজের সিটে বসে সালেকের বাবা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ।

হট্টগোল শুনে সালেকের বাবার হুঁশ হলো। একজন আর্মি তার সামনে। তার পাশের ভদ্রলোক আইডি মেলে বসে আসে। প্লাটফর্মে লাইন লম্বা হচ্ছে। তাদের নিয়ে যাবে মিলিটারি ক্যাম্পে। তাদের ভেতর একজন সে চার পাঁচ বছরের মেয়ের বাবা। পুতুলের মতো দেখতে মেয়েটা। বাবার গলা ধরে মুখে চুমু দিচ্ছে আর কাঁদছে চিৎকার করে। বাবাকে ছাড়বে না। বলছে, বাবা! তুমি আমার জান, তোমাকে ছাড়ব না। কিছুতেই যেতে দিব না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না! সালেক ফোঁপায়ে কেঁদে উঠল। বাবাকে জড়ায়ে ধরল।

ট্রেন ছাড়ল। মানুষ গুলো চুপচাপ যে যার ছিটে বসা।

বিশাল বড়ো দাদা বাড়ি সালেকের। চাচাতো ভাইবোন অনেক। স্কুল নেই। পড়াশুনা নেই। সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো। এখন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে। ডাল কেটে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাইফেল বানিয়েছে। খুব জমে ওঠে খেলাটা।

খেলতে খেলতে দাদা বাড়ির আম কাঁঠালের বাগান পার হয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে। সালেকের মনে হচ্ছে সত্যি যেন সে যুদ্ধ করছে।

একদিন গভীর রাতে ফিসফিস কথা শুনতে ঘুম ভাঙলো সালেকের। বড়ো চাচার ছেলে রফিক ভাই এসেছে। কাঁধে রাইফেল। বাইরে তার সাথিরা দাঁড়ানো। চাচি পোটলা করে খাবার বেঁধে দিচ্ছে। বুকে টেনে কাঁদছে। তারপর দোয়া করে দিল।

সালেক রফিক ভাইয়ের হাত টেনে ধরে বলল, আমিও যুদ্ধ করবো! আদর করে দিয়ে রফিক ভাই বলল, সাবাস! তবে তোর যুদ্ধের বয়স হয়নি। যুদ্ধের বয়স হলে ঠিকই আগরতলায় পাঠায়ে ট্রেনিং দিয়ে আনবো তোকে। সালেক যুদ্ধে যাবে। কাউকে না বলে ঘরের বের হয়। মানুষের সাথে হাঁটতে হাঁটতে নৌকা ঘাটে আসে। সাথের মানুষজন আত্মীয়ের মতো। যাবে সীমান্তের ওপারে। নৌকা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এল আখাউড়া।

অনেক মানুষ চারদিক দিক থেকে আসছে। সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরা। আগরতলা তার রাজধানী। এখানে আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ। সালেক লাইনে দাঁড়ানো। উচ্চতা তার ভালো। যে নাম লিখছে সে তার বয়স শুনে থামল। বলল, তোমার বয়স বারো বছর?

হ্যাঁ

মা বাবাকে বলে এসেছ?

না। বললে আসতে দিত না।

লোকটা কড়া করে না বলে দিল। বলল এত অল্প বয়সি কাউকে যুদ্ধে নেবার নিয়ম নেই।

সালেক ঠাঁই দাড়িয়ে থাকল। তার লাইন থমকে আছে। লোকটা উপায় না দেখে তার উপরের একজনকে ডেকে নিয়ে এল। সে সালেকের চোখের দিকে তাকাল। বলল, ট্রেনিং এ নাও। যদি সব ট্রেনিং পাস করে তখন দেখা যাবে।

সালেক তাতেই খুশি। সালেক তাকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করল। হ্যান্ডসেক করল।

ক্যাম্পে এসে কাগজ কলম যোগার করে মাকে চিঠি লিখল। ট্রেনিং লিডার বলেছে তাকে দিলে সে চিঠি পোস্ট করে দিবে।

সালেক সব কিছু খেয়াল করে শোনে। শিখে নিচ্ছে দ্রুত সব কিছু। ট্রেনিং শেষে পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো করল কিশোর সালেক।

ট্রেনিং শেষ করে সালেক আসে মেলগড় ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পে প্রস্তুত করা হয় যুদ্ধের জন্য। দলবেঁধে দেয়া হয়।

গেরিলা যুদ্ধের অনেক কৌশল শিখলো সালেক এখানে। জানলো বিপদে পড়লে নিজের জীবন দিয়ে অন্যদের জীবন রক্ষা করতে হয়। শিখলো একজন

মানুষ কীভাবে দশজনকে এক সাথে মোকাবিলা করে। সালেককে এখন আর কেউ ছোটো ছেলে হিসাবে দেখে না। সে সবার সমীহ আদায় করে নিয়েছে। গম্ভীর থাকে। কথা বলে কম।

চেহারায় এসেছে কত পরিবর্তন!

এক রাতে সীমান্ত পার হয়। তার কাঁধে রাইফেল। তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটা দলে যোগ হবে। তারপর যাবে আশুগঞ্জের দিকে।

কখনো গাড়িতে কখনো পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দেয়। ক্যাম্পে ক্যাম্পে থেমে একটু বিশ্রাম নেওয়া। পথের মানুষ তাদের বুকে টেনে নেয়। তারা না খেয়ে তাদের খাইয়ে দেয়।

এর মধ্যে অনেকগুলো অপারেশনে তাদের দল অংশ নিয়েছে। ওৎ পেতে থেকে পাকিস্তানি সেনাদের গাড়ি বহরের উপর হামলা করেছে। হামলা করে ওদের অস্ত্র নিয়ে দ্রুত সড়ে পড়ে। মনোবল বেড়ে গেছে তাদের দলের সবার।

একদিন রাতে চন্দ্রগড় ক্যাম্প ছেড়ে রওনা দিলো। লাইন করে হেঁটে যাচ্ছে। কখনো রাস্তা দিয়ে। কখনো রাস্তা থেকে নেমে ধান ও পাটের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ গুলি শুরু হলো। তাদের কথা কেউ হয়ত জানিয়ে দিয়েছে শত্রুদের। দলের নেতা বললেন সবাইকে মাটিতে শুয়ে পড়তে। পালটা গুলি ছুঁড়ল তারাও। কনুইতে ভর দিয়ে সালেক একটা শুকনো ডোবার মধ্যে রাইফেল তাক করলো। তাদের একজনের গায়ে গুলি লেগেছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে। তাকে ক্যাম্পে নিতে হবে। দলনেতা বললেন, ওরা সংখ্যায় অনেক। মনে হচ্ছে ওরা জেনে শুনে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছন ফিরতে হবে।

সালেক চিৎকার করে বলছে তখন, তোমরা যাও! আমি একাই আটকে রাখবো। দলনেতা কী করবে বুঝতে পারছে না। সালেক আবার চিৎকার করে বলে, আমি সামাল দিচ্ছি তোমরা যাও! সে যেন তখন যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। তার আদেশ অমান্য করে এমন সাধ্য কার!

সালেক অবিরাম গুলি ছুঁড়তে থাকে। গুলি ছুঁড়ছে দ্রুত। তার হাত ও আঙুল নড়ছে একই ছন্দে। গুলি করছে এমন ভাবে বিভিন্ন কোণ থেকে শত্রু তাদের সংখ্যা বুঝে উঠতে পারছে না। অন্ধকারে ভয়ে আগাতেও পারছে না। সালেক সারারাত ধরে গুলি ছুঁড়েছে বিরামহীন। শত্রুর গুলি বন্ধ হয়েছে। যে কয়জন বেঁচেছিল তারা পালিয়েছে।

সকালে সহযোদ্ধারা ফিরে আসে সালেকের অবস্থা দেখতে। সারারাত তারা জেগে গুলির শব্দ শুনেছে। তাদের যার গায়ে গুলি লেগেছিল তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে ক্যাম্পে। এসে দেখে সেই ডোবার মধ্যে সালেক ট্রিগারে আঙুল রেখে শত্রুর দিকে রাইফেল তাক করে আছে। ❑

গল্পকার

অপারেশন ধলেশ্বরী

অলোক আচার্য

ছেলেটার চুল উশকোখুশকো। চোখ জ্বলজ্বল করছে। গায়ের রং কুচকুলে কালো। বসে আছে কমান্ডার লতিফের সামনে। পলাশপুর গ্রামের ধলেশ্বরীর পাশের জঙ্গলমতো একটা জায়গা। এখান থেকেই অপারেশন ধলেশ্বরী পরিচালিত হবে। নদীর মাঝ পয়েন্টে মিলিটারির একটা গানবোট উড়িয়ে দিতে হবে। সেজন্য লতিফ নয়জনের একটি দল নিয়ে এখানে এসেছে। আশপাশের খবর সংগ্রহ করছে। একেবারে নির্জন স্থান। এখান থেকে দুই কিলোমিটার নদী সাঁতরে ঢুকতে হয় গ্রামে। মিলিটারিরা এই গ্রামে ভয়ংকর অত্যাচার চালিয়েছে। গানবোটটা এমন জায়গায় যে সেটি না উড়িয়ে গ্রামেও ঢোকা যাচ্ছে না। গ্রাম থেকে কেউ পালাতে চাইলেও পারছে না। গ্রামের ভিতরের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য একজন দরকার ছিল। তখনই ভোজবাজির মতো হাজির হয় মতি। মতির বয়স নয়-দশ বছর। কথাবার্তা সোজাসাপটা। কে পাঠিয়েছে, কীভাবে তাদের খবর পেয়েছে সেটাও জানে না। ছেলেটার সাথে রাজাকারদের কোনো যোগাযোগ আছে কি না সেটা বুঝতে পারছে না লতিফ। সমস্যা হলো মতিকে চলে যেতে বললেও সে যাচ্ছে না। আমি যামু না বলে ঘাড় বেঁকিয়ে বসে থাকে। একে নিয়ে কি করা যায় সেটা

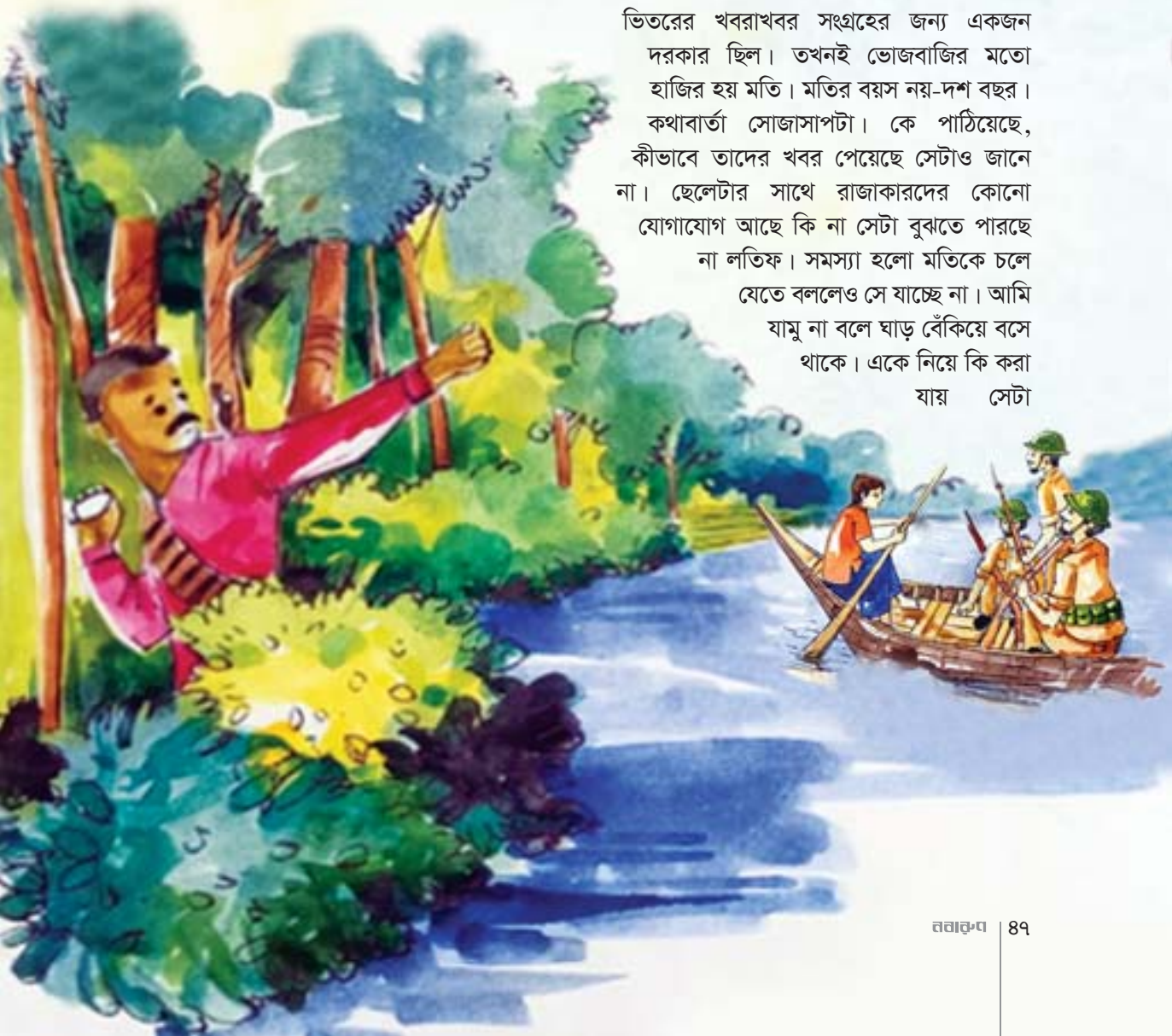

ভেবে বের করার চেষ্টা করছে লতিফ। অন্যরা সবাই সন্দেহের চোখে দেখছে মতিকে।

স্যার, আমি গ্রেনেড চালাইতে পারি। এইভাবে পিন খুলে হাত দিয়ে ছুড়তে হয়। লতিফ এ কথায় কোনো আগ্রহ দেখায় না। তার চোখে কিছুটা সন্দেহ। এই ছেলেটাকে গ্রেনেড চালাতে কে শেখালো? আশ্চর্য! এইটুকু ছেলে!

তুই আর কি চালাতে পারিস? এসএমজি চালাতে পারিস? রাইফেল?

না। তয় শিখায় দেন। একেবারে ঝাঁঝরা কইরা দিমু পাকিগো বুক।

তুই আমাদের এই অপারেশনের খবর পেলি কীভাবে?

পাইছি একভাবে।

আর কোনো কথা বলে না। চুপচাপ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের দৃষ্টি গভীর। এবং হিংস্র। যেন নিমিষেই সব ছারখার করে দিবে। পরদিন অপারেশন ধলেশ্বরী।

সন্ধ্যার পরপর ওরা বেড়িয়ে যায়। পথ বেশি না। তবে বিপদসঙ্কুল। যে-কোনো দিক থেকে আক্রমণ হতে পারে। রাজাকাররা ওৎ পেতে আছে। মিলিটারির গানবোট শকুনের দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করছে। ওটা ধ্বংস করতেই হবে। তাই ওদের যাত্রা হবে একেবারে শব্দহীন নিখুঁত যাত্রা। নদীর তীর থেকে ওরা সবাই গায়ে কাঁদামাটি মেখে নেয় ভালো করে। লতিফরা কেউ জানে না মতি নামের এই ছোট্ট ছেলেটিরও গেরিলা ট্রেনিং আছে। এই গ্রামের দায়িত্ব আছে ওর উপর। ওদের সাথে আছে কিশোর ছেলেটি। রাস্তা সব চেনা। এই দিক দিয়া আক্রমণ করতে হইবো। হাত দিয়ে ইশারা করে জায়গাটা দেখায়। যেন ছবির মতো পরিকল্পনা পরিষ্কার। ওর দেখানো পথে খানিকটা এগিয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধার দলটি। লতিফ এবার সবাইকে হাত ইশারা করে থামতে বলে। ইশারা পেয়ে সবাই থেমে যায়। ওদের তিনজনকে ইশারা করতেই এক হাত উঁচু করে অন্য হাতে গ্রেনেড নিয়ে জলে নেমে যায়। বেশি দূর না। জলও বেশি নেই। এগিয়ে যেতে হবে একেবারে চুপিচুপি। কোনোভাবেই ধরা পরা চলবে না। পিছনে এসএমজি হাতে পজিশনে থাকে বাকি যোদ্ধারা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ওদের উপর বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ হতে থাকে। এটা ওদের পরিকল্পনায় ছিল না। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না কেউ। ওরা সম্ভবত আগেই জেনে গেছে ওদের পরিকল্পনা। কিন্তু কে? সন্দেহ যায় অপরিচিত কিশোরের উপর। লতিফ আদেশ করে ফিরে আসতে। এখনও পালিয়ে আসা সম্ভব। সবাই চলে আসে। তবে আশপাশে কোথাও কিশোরটিকে খুঁজে পায় না দলটি। মতি তখন অন্য দিক দিয়ে জলে নেমে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সেদিকে মিলিটারির দল খেয়াল করেনি। ডুব দিয়ে একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। যখন মিলিটারির দলটি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন মতি উলটো দিক দিয়ে প্রথমে একটা গ্রেনেড ছুড়ে মারে। একেবারে নিঁখুত আক্রমণ। তারপর আরেকটা। পরপর তিনটা গ্রেনেড দিয়ে গানবোটটা প্রায় ধ্বংস করে দেয় মতি। নিরাপদ দুরত্বে বসে কালো ধোঁয়া উড়তে দেখে লতিফ কমান্ডারের দল। ❑

শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

পতাকা বুড়ো

খান সাকিব-উল হুসেন

ঠিক দুপুরবেলা। খেয়ে দেয়ে যেই ভাতঘুমটা দেবে অমনি টুপ্পুর কানে ফেরিওয়ালার হাঁকডাকের মতো কিছু শব্দ খেলা করতে লাগল। ধীরে ধীরে শব্দগুলো কাছাকাছি চলে আসে। এবার স্পষ্ট শুনতে পায় টুপ্পু।

‘পতাকা নেবে গো পতাকা।
লাল-সবুজের পতাকা।
আমার দেশের পতাকা।’

না এত ফেরিওয়ালা না। ফেরিওয়ালা হলে বড়ো আব্বু বাসার কাছে আসতে না আসতেই তাড়িয়ে দিত। ফেরিওয়ালাদের ঠিক একটা পছন্দ করে না বড়ো আব্বু। তার এক বিশাল কারণ আছে। ছোটো করেই বলি কেমন। কয়েক বছর আগে একটা ফেরিওয়ালা এসেছিল বাসায়। ঠিক সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বড়ো আব্বু, আব্বু, ছোটো চাচ্চু কেউ তখন বাসায় ছিল না। শুধু নারীরাই ছিল। তো হয়েছে কী,

সদর দরজার একটু পাশেই রাখা ছিল বড়ো আব্বুর কাঁসার গ্লাস। ফেরিওয়ালাটা আশপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ নাই অমনি কাঁসার গ্লাসটা থলেতে ভরে সটান। সেই থেকেই ফেরিওয়ালাদের উপর বড়ো আব্বুর একটা বিরাট ক্ষোভ।

সে যাকগে। জানালা খুলে রাস্তার দিকে তাকাল টুপ্পু। একটা লোক আসছে। গায়ে লাল-সবুজের পতাকা জড়ানো। আবার শোনা যাচ্ছে তার হাঁকডাক।

'গল্প শুনবে গো গল্প।
পতাকার গল্প।
লাল-সবুজের পতাকার গল্প।
আমার দেশের পতাকার গল্প।'

লোকটা ঠিক টুপ্পুর জানালার কাছে এসে যায়। টুপ্পু এবার বলে ওঠে, 'এই যে এদিকে একটু শুনো তো।'

'তুমি পতাকার গল্প শুনবে খোকা?', লোকটি বলল।

'পতাকার আবার গল্প হয় বুঝি!'
'হয় খোকা হয়। শুনবে নাকি তুমি?'
'শুনব, শুনব। দাঁড়াও বাইরে আসি।'

টুপ্পু এক লাফে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। ছুটে যায় পতাকা জড়ানো লোকটির কাছে। বসে পড়ে কাঁঠালগাছের তলায়।

টুপ্পু বলল, 'তা কী যেন গল্প শোনাবে বলছিলে?'

'পতাকার গল্প খোকা। আমার দেশের পতাকার গল্প।'

'তা শোনাও দেখি।'

'শোনো খোকা শোনো। তখন ১৯৭১ সাল। আমরা তখনও পাকিস্তানের একটা প্রদেশ মাত্র। পাকিস্তানের পতাকাই আমাদের পতাকা। সেসময় দেশে অরাজক পরিস্থিতি চলছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন-তখন হামলা করতে পারে এদেশের মানুষের উপর। ঠিক ঠিক ২৫শে মার্চ হামলা করে বসল আমাদের উপর। ঢাকা শহরে গণহত্যা চালাল। হাজার হাজার মানুষ মারল একরাতে। ধীরে ধীরে তা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। হানাদার বাহিনীরা গ্রামেও নারকীয় গণহত্যা ও নির্যাতন চালাতে লাগল। আমার তখন সবে পনেরো পেরিয়ে ষোলো হয়েছে। রক্ত গরম। তো আমিও চলে গেলাম।

'কোথায় গেলে?', টুপ্পু বলে উঠল।

'অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে, যুদ্ধ করতে হবে হানাদার বাহিনীদের বিপক্ষে। দেশকে মুক্ত করতে হবে তো। আমরা দীর্ঘ একমাস প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ফিরে এলাম তারপর একেক স্থানে অপারেশন চালাতে লাগলাম। মানে হানাদার নিধন অপারেশন। কত কত ভাই, চাচা যে চোখের সামনে গুলি খেল। বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল হানাদারবাহিনীরা। আমরাও কম কিসে, সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দীর্ঘ নয়মাস লড়াই করার পর আমরা পেলাম নতুন এক পতাকা। লাল-সবুজের পতাকা। যে পতাকায় মিশে আছে ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্ত, আড়াই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম।'

লোকটি কান্না করছে। ঝরঝর করে জল পড়ছে। টুপ্পু কাছে গিয়ে চোখ মুছে দিয়ে বলল, 'তোমরা আমাদের পতাকা দিয়েছ। লাল-সবুজের পতাকার গল্প। তোমরা আমাদের দেশের গর্ব।'

লোকটি বলল, 'তুমি খুব ভালো ছেলে। এই নাও একটা পতাকা। তুমিও কিন্তু সবাইকে জানিয়ে দেবে আমাদের পতাকার গল্প।'

'অবশ্যই শোনাব।'

'আজকে আমি যাই। অন্যদেরও গল্প শুনিয়ে আসি। পতাকার গল্প। আমার দেশের পতাকার গল্প।'

আবারও লোকটা বলতে শুরু করল, 'পতাকা নেবে গো পতাকা।

লাল-সবুজের পতাকা।
গল্প শুনবে গো গল্প।
আমার দেশের পতাকার গল্প।'

টুপ্পু আরেকবার ডাক দিয়ে বলল, তোমার নামটা শোনা হলো না যে। কি নাম তোমার?'

'পতাকা বুড়ো।' ❑

গল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক

পদ্মরেশম

আতিকুর রহমান

খালবিলের বাংলাদেশে বর্ষা আলোকিত করে শাপলা ও পদ্ম ফুল। শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। আর পদ্ম ভারত আর ভিয়েতনামের। শাপলা ও পদ্ম ফুল দুটোই জলজ উদ্ভিদ। দুইটি ফুলেরই পাতা ও ফুল পানির উপরে ভেসে থাকে কিন্তু মূল পানির নিচের মাটিতে থাকে। উভয় ফুলের রং একই। সাদা, নীল, লাল ইত্যাদি। প্রথম দেখায় কোনটি শাপলা ও কোনটি পদ্ম বোঝা দুষ্কর। সাধারণ দৃষ্টিতে. পদ্ম ফুলের পাতা সাধারণত সম্পূর্ণভাবে গোল বা বৃত্তাকার হয়ে থাকে। কিন্তু শাপলা ফুলের পাতার একপাশ থেকে অল্প কিছুটা কাটা থাকে। শাপলা ফুলের পাতা সাধারণত পানির মধ্যে ভাসতে থাকে। অপরদিকে পদ্ম ফুলের বেশিরভাগ পাতা সাধারণত পানি থেকে কিছুটা উপরে থাকে যদিও অনেক পাতা পানিতে ভাসতে থাকে। পদ্ম ফুলের আকার সাধারণত শাপলা ফুলের চেয়ে বড়ো হয়ে থাকে। একটি শাপলা ফুল গড়ে প্রায় ৩০.৫ সেমি হয়ে থাকে। অপরদিকে একটি পদ্ম ফুল প্রায় ১৫২ সেন্টিমিটারের মতো হয়ে থাকে। পদ্ম ফুলের পাতার মতো পদ্ম ফুলও পানিতে ঠিক ভাসে না বরং পানি থেকে অল্প কিছুটা উপরে অবস্থান করে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের শাপলা ও পদ্ম ফুলের পার্থক্য সম্পর্কে জানোনোর কারণ হলো আমি এবার তোমাদের পদ্ম ফুল নিয়ে নতুন কিছু জানাবো। দুটো ফুল যেন তোমরা না মিলিয়ে ফেল।

প্রকৃতি থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার হলে এটি হয় পরিবেশবান্ধব। এমন একটি উপাদান হলো পদ্ম রেশম। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি সুতার বাজারে সারা বিশ্বে একটি নতুন বিপ্লব চলছে, যার অন্যতম উদাহরণ পদ্মফুলের ডাঁটা থেকে তৈরি সুতায় বোনা পদ্মরেশম। এককালে ঢাকাই মসলিনের নামডাক ছিল বিশ্ব জুড়ে। একসময় মসলিনের বুনন বিলুপ্ত হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় ঐতিহ্যবাহী সেই কাপড় বোনার অনন্য শিল্পকর্ম।

বছর কয়েক আগে ঢাকাই সেই মসলিনের পুনর্জন্ম হয়েছে। সে-ই কারিগরি দক্ষতা কাজে লাগিয়ে এবার পদ্ম ফুলের ডাঁটা থেকে তৈরি সুতায় বানানো হয়েছে বিশেষ একটি স্কার্ফ, যা পদ্মরেশম বা লোটাস সিল্ক নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এটি এখনও একটি নতুন বিষয় হলেও, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহু বছর ধরে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। মিয়ানমার, ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার মতো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে দীর্ঘ সময় ধরে পদ্মরেশমের উৎপাদন এবং ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে বাংলাদেশের জন্য এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যা আমাদের পরিবেশ এবং অর্থনীতির জন্য বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। পদ্ম ফুলের ডাঁটায় থাকা একধরনের আঠা থেকে তৈরি হয় এই সুতা। সেই সুতায় তৈরি সিল্ককে বলে লোটাস সিল্ক। সারা বিশ্বে এই লোটাস সিল্ক অনেক দামি কাপড়। গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে পদ্মরেশম সফলভাবে তৈরি করতে পারায় আমাদের বস্ত্র বয়নশিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কারণ, বাংলাদেশে অনেক পদ্মবিল রয়েছে। এসব বিলে সারা বছরই পানি থাকে এবং যে-কোনো সময় চাইলে পদ্ম ফুলের ডাঁটা সংগ্রহ করা যায়।

গোলাপি পদ্মের (Nelambo Nucifera) ডাঁটা পদ্মরেশম সুতা তৈরির জন্য আদর্শ। অন্য পদ্ম থেকেও সুতা তৈরি হতে পারে। অন্যান্য পদ্মের ডাঁটায় সেলুলোজের পরিমাণ কম থাকায় বাণিজ্যিকভাবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

পদ্মের এক-দুটি ডাঁটা নিয়ে এক ইঞ্চি পরপর ভাঙার পর এক ধরনের আঠা পাওয়া যায়। পদ্মডাঁটার আঠাসদৃশ এই পদার্থ এক ধরনের জৈবযৌগ। এটা বস্তুত সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও অন্যান্য উপাদানের (পেকটিন, লিগনিন, ফ্যাট ও অ্যামাইনো অ্যাসিড) সমষ্টি; যা বাতাসের সংস্পর্শে এসে জমাট বাঁধে। পদ্মের ডাঁটায় থাকে অসংখ্য ছোটো ছোটো কূপ। সেখানে জমে থাকে আঠাসদৃশ পদার্থ। এই আঠা নৈপুণ্যের সঙ্গে পাকিয়ে সুতা তৈরি করা হয়। এই সুতা বাতাসে দ্রুতই শুকিয়ে যায়। রোদে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এই সুতা থেকেই কাপড় তৈরি করা যায়। এই ডাঁটার সংখ্যা বেশি হলে সুতা মোটা হবে। আর ডাঁটার সংখ্যা কম হলে সুতা সরু হবে।

পদ্মরেশমের বৈশিষ্ট্য পদ্মরেশম সুতার রং হালকা দুধে হলুদ। এর ঘনত্ব প্রতি সেন্টিমিটারে ১.১২ গ্রাম। সুতি সুতা ও মালবেরি সিল্ক সুতার চেয়ে এই সুতা শক্ত, টেকসই ও শতভাগ পানিরোধী। তবে অধিক প্রসারণযোগ্য না হলেও এই সুতা কোঁচকায় না অথ্যাৎ রিঙ্কল ফ্রি । প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল, কোমল ও বায়ু চলাচলকারী। এতে চমৎকার রং ধরে এবং যে-কোনো রং করলেই তা হয় আরও সুন্দর। ফলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে এই আঠাকে সুতায় রূপান্তর করা যায়। এই আঠার বৈশিষ্ট্য অনেকটা ফুটি কার্পাস তুলার মতো বলে আমাদের দেশের নারীরা সহজেই উন্নতমানের সুতা কাটতে পারেন। আর সেটি প্রমাণও করেছেন ফরিদপুরের কানাইপুরের রনকাইল গ্রামের নারীরা। মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষণেই তাঁরা চমৎকার সুতা কাটতে সক্ষম হয়েছেন। মাস ছয়েক আগে এই নারীরা সরু সুতা তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশে সাধারণত আগস্ট থেকে ডিসেম্বর সুতা কাটার ভালো সময়। পদ্মফুলও এ সময় ভালো পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি হয় তাই অন্য যে-কোনো সিল্ক সুতার চেয়ে পদ্মরেশম সুতা কাটা সহজ ও পরিবেশবান্ধব। এই সুতা উৎপাদনে পানির প্রয়োজন হয় না এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার না হওয়ায় কার্বন নিঃসরণও হয় না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখে না।

পদ্মের ডাঁটা কেটে নিলে পানির নিচে আবার বাড়তে থাকে। এই বৃদ্ধি প্রতিদিন অন্তত ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি। ফলে প্রতি মাসে কম করে হলেও পাঁচবার পদ্মের ডাঁটা সংগ্রহ করা সম্ভব। ডাঁটা সংগ্রহ থেকে শুরু করে কাপড় তৈরি পর্যন্ত এক মাস সময় লাগে বলে জানিয়েছেন পদ্ম-গবেষক শিকদার আবুল কাশেম শামসুদ্দীন।

আমাদের দেশে পদ্মরেশম বা লোটাস সিল্ক নতুন হলেও পূর্ব এশিয়ায় বিশেষত মিয়ানমার, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া এর উৎপাদনের আছে দীর্ঘ ইতিহাস। এর উদ্ভাবক হিসেবে প্রথম নাম আসে মিয়ানমারের উইম সান নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর, যিনি ১৯ শতকে এই প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। ২০১৭ সাল থেকে ভিয়েতনাম, ২০০৩ সাল থেকে কম্বোডিয়া বাণিজ্যিকভাবে পদ্মরেশমের কাপড় তৈরি শুরু করে। ভারত যোগ দিয়েছে ২০১৯ সাল থেকে।

এই সুতা পরীক্ষামূলকভাবে ৭ ধরনের রং করা হয় ।তাঁতে জামদানি বয়নকৌশল অবলম্বনে এই সুতা থেকে প্রাথমিকভাবে ৬ গজ দৈর্ঘ্যের একটি স্কার্ফ বোনা হয়। একটি বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনকে প্রদান করা হয়েছে। সেগুনবাগিচার অফিসে গেলে এই স্কার্ফটি দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. তাজউদ্দিন।

ইতোমধ্যে এই রেশমের মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি প্রথম আবেদন করা হয়। এরপর ২০২৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর পুনরায় আবেদন করলে এর গুরুত্ব বিবেচনায় এ বছরের ১১ই জানুয়ারি অনুমোদন দেয়।

শিশুর নিরাপত্তায় করণীয়

আমাদের এ সময়ে অনেক পরিবারই আছে যারা মা-বাবা দুজনই চাকরি করছেন। একই সঙ্গে অফিস বাসা এবং শিশুর দায়িত্ব পালন করা কঠিন। এমন অনেক একক পরিবার আছে যেখানে বাবা-মা কাজে বাইরে গেলে শিশুকে বাড়িতে একা থাকতে হয়, তখন তাদের মন শিশুদের উপর পড়ে থাকে। তাদের সন্তানদের বাসায় দেখাশুনার জন্য কেউ থাকেন না। এক্ষেত্রে সন্তানকে বাসায় একা রেখে যেতে হয়। এটি শিশুর জন্য নিরাপদ নয়। সেজন্য বিশেষজ্ঞরা শিশুদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ে সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে শিশুদের বাড়িতে একা রেখে গেলেও চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন। নবারুণ বন্ধুদের জন্য সে বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো—

নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিয়ম শেখানো

শিশুরা যাতে ঘরে এবং বাইরে নিরাপদ থাকে সে জন্য শৈশব থেকেই কিছু নিরাপত্তার বিষয়ে ধারণা দিতে হবে। বাসায় কেউ এসে যখন ডোরবেল বাজাবে, তখন দরজা খোলার আগে দরজার ওপাশে কে আছে তা দেখা উচিত। এ সময় অপরিচিত কারো জন্য দরজা খোলা যাবে না। প্রথমে বাবা-মা'কে জানাতে হবে এবং তারা যখন বলবেন তখনই দরজা খুলতে হবে।

কঠিন পরিস্থিতির জন্য তৈরি করা

বাড়িতে একা থাকলে শিশুকে কঠিন পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। বাসায় রেখে গেলে মোবাইল ফোন দিতে হবে। মা-ববার নম্বর ছাড়াও বিশ্বস্ত ব্যক্তির নম্বরও দিতে হবে, যেন প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারে। এছাড়াও, জরুরি পরিষেবা যেমন–ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্সের নম্বর মোবাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

খাবার ও পানির ব্যবস্থা রাখা

বাসায় থাকলে শিশুরা বারবার খেতে চায়। সে জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং শিশুদের নাগালের মধ্যে রাখা আবশ্যক। বাবা-মা বাসায় না থাকলে কোনোভাবেই চুলায় আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়াও শিশুদের ক্ষতি করতে পারে এমন সব জিনিস নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

ব্যস্ত রাখতে কিছু কাজ দেওয়া

যখন শিশুটি বাড়িতে একা থাকবে, খেয়াল রাখতে হবে যেন সে বিরক্ত না হয়। এর জন্য তাকে কিছু কাজ দেওয়া যেতে পারে। সুন্দর কিছু ছবি আঁকতে পারে, তার প্রিয় বই পড়তে পারে। এছাড়া টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ট্যাবে শিক্ষামূলক কোনো অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা রাখা।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

ক্যামব্রিজে 'কিওরি পেক্রা উও'

বাংলাদেশের প্রথম ম্রো ভাষার চলচ্চিত্র 'কিওরি পেক্রা উও' এবার প্রদর্শিত হলো যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সিনেমাটির ইংরেজি নাম 'ডিয়ার মাদার'; বানিয়েছেন এস কে শুভ সাদি এবং সিনেমাটির সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন উত্তম মারমা উচিং।

৬৭ মিনিটের এই সিনমাটি মুক্তি পায় ২০২৩ সালে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমাটি দেখানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর যাত্রা অব্যাহত রাখতে সিনেমাটি কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া এবং স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়েছে। এবার ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হলো।

চলচ্চিত্রটির আসল প্রাণ হলো লামার ম্রো পাড়ার মানুষেরা, যারা শুধু অভিনেতা নয়, বরং নিজেরাই হয়ে উঠেছিলেন একেকজন গল্পকার।

সিনেমাটি অপোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (কোরিয়া) অফিশিয়াল সিলেকশন পেয়েছে।

এছাড়াও সিনেমাটিকে আমস্টারডামের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্স সংরক্ষণ করেছে, যাতে এটি ভবিষ্যতে গবেষক ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপায়

আত্মবিশ্বাস থাকা সব মানুষের প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুদের আত্মবিশ্বাস থাকা খুবই জরুরি। আমাদের সবারই কিছু না কিছু সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকায়, সেই প্রতিভা অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। তাই শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সবার নজর রাখা আবশ্যক। অন্যের সঙ্গে তুলনা কিংবা সারাক্ষণ বকাবকি করলে, শিশুদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। তাই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে কিছু ভূমিকা রাখা আবশ্যক তা নিম্নরূপ :

১. তাদের মনে দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে। তাকে ছোটো ছোটো কাজে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেমন- নিজের বইপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজের হাতে খাওয়া, জামাকাপড় গুছিয়ে রাখার মতো ছোটো ছোটো কাজ শিশুদের দিতে হবে।

২. শিশু যেন নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে সে জন্য তাকে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, তার নিজের পোশাক পছন্দে সিদ্ধান্ত নেওয়া। বাবা-মা-ই তাদের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দেওয়া ও তার মতামতকেও প্রাধান্য দেওয়া।

৩. পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতায় খারাপ ফলাফল করলেও তাকে বকাবকি না করা। বরং তাকে উৎসাহিত করতে হবে পরের বার আরো ভালো করার জন্য।

প্রতিবেদন : আরমান হোসেন দেওয়ান

মুগ্ধের চমক

খেলা মানে অঘটন। ক্রিকেট, ফুটবল হোক বা দাবা, অঘটন ঘটতে দেখা যায়। এ বার সেই অঘটন ঘটালেন বাংলাদেশের এক দাবাড়ু। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ম্যাগনাস কার্লসেন। ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছেন বাংলাদেশের ৯ বছর বয়সি দাবাড়ু রায়হান রশিদ মুগ্ধ।

১৮ই জানুয়ারি ২০২৫ কার্লসেনের সঙ্গে অবিশ্বাস্য অনলাইন দাবার সবচেয়ে বড়ো প্লাটফর্ম চেস ডট কম-এ ম্যাচটি খেলেন রাজধানীর সাউথ পয়েন্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র মুগ্ধ। যে গেমটি খেলেছে সেটার নাম বুলেট ফরম্যাট গেম। এটা খেলার নিয়ম হলো, এক মিনিটের মধ্যে ম্যাচটি দ্রুত শেষ করতে হবে। ফিদে মাস্টার, আন্তর্জাতিক মাস্টার, গ্র্যান্ড মাস্টারসহ খেতাব পাওয়া দাবাড়ুরা অনলাইনে এই টুর্নামেন্ট নিয়মিত খেলেন। তবে কার সঙ্গে কার খেলা পড়বে সেই পেয়ারিং আগে থেকে জানার উপায় থাকে না। সফটওয়ারের মাধ্যমে এক রাউন্ড পর এক রাউন্ড নির্ধারিত হয় কে কার সঙ্গে খেলবে। সেভাবেই সৌভাগ্যক্রমে ম্যাগনাস কার্লসেনের মুখোমুখি হয় মুগ্ধ। যা তাকে তার প্রতিভা প্রদর্শনের একটি দারুণ মঞ্চ তৈরি করে দেয়।

চেস ডট কম খেলতে হলে সাধারণত ওই নির্দিষ্ট দাবাড়ুকে নিজের প্রোফাইল থেকে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে হয়। কিন্তু মুগ্ধর এখনও কোনো খেতাব পাওয়া হয়নি। চেস ডট কম নিজের কোনো প্রোফাইলও নেই। তাই জাতীয় দলের আরেক দাবাড়ু ও তার কোচ নাঈম হকের প্রোফাইল থেকে খেলায় অংশ নেয় মুগ্ধ। আর সেখানেই পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কার্লসেনকে হারিয়ে দিয়েছে সে। নানা সীমাবদ্ধতার পরও মুগ্ধ যা করে দেখিয়েছে, অনেক পেশাদার দাবাড়ুও তা কল্পনাতেই আনতে পারেন না। মুগ্ধ এমন এক কীর্তি গড়েছে, যা বিশ্ব দাবা অঙ্গনকে হতবাক করে দিয়েছে।

মুগ্ধর কোচ নাঈম দেশের গণমাধ্যমকে জানান- 'আমি মুগ্ধকে খেলা শেখাই। ও সব সময় অনলাইনে খেলতে চায়। আমি বললাম, তাহলে আমার আইডি দিয়ে খেলো। এরপর ও হঠাৎ ফোন করে বলে কার্লসেনকে হারিয়ে দিয়েছে। শুনে তো আমি বিশ্বাস করিনি। ও এরপর খেলার স্ক্রিনশটসহ সব তথ্য পাঠিয়ে দেয় আমাকে।'

মুগ্ধর এই জয় তার ধারাবাহিক সাফল্যের তালিকায় একটি নতুন মাইলফলক। সে বাংলাদেশের বর্তমান অনূর্ধ্ব-১০ জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন এবং গত ডিসেম্বরে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। মুগ্ধর বাবা মাহবুবুর রশিদ এবং কোচ তার এই সাফল্যে গর্বিত। মুগ্ধর সাফল্যকে বাংলাদেশের জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ক মুহূর্ত বলে অভিহিত করেন সবাই।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

তিমিরাও গান গায়

ইশমাম রাজ

পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীরই খাবারের প্রয়োজন হয়।আর এই খাবারের জোগান দিতেই সবার প্রানান্ত ছুটে চলা। এরপর যখন খাবার সামনে পেয়ে যায় তখন অনেকে খুশিতে গান গাইতে থাকে। এই খুশিতে গান গাওয়া বিষয়টি যদি হয় তিমিদের বেলায়, তাহলে কেমন হয়। তেমনি একটি গবেষণাধর্মী বিষয় তুলে ধরব তোমাদের সামনে। তিমিরাও যে গান করে তা অনেকেরই অজানা। হ্যাঁ বন্ধুরা, খাওয়াদাওয়া ভালো হলে তিমিও গান গায়, আর সেই গান পিয়ানোর সুরের মতোই মধুর! অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমন ঘটনা যে প্রকৃতই ঘটে, তা দেখা গেছে নতুন এক গবেষণায়।

গত কয়েক বছর ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের উপকূলে এ গবেষণা চালানো হয়। গবেষণাটি করেছে সংবাদমাধ্যম দ্য কনভারসেশন। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে পিএলওএস ওয়ান সাময়িকীতে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়, তিমিদের বাস্তুসংস্থানে পরিবর্তন হলে, তার আভাস পাওয়া যায় সেগুলোর গানে। তিমির জন্য খাবারের দারুণ এক উৎস হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এই অঞ্চল থেকে বংশবিস্তারের জন্য প্রতি বছর বহু দূরে পাড়ি দেয় তিমিরা। যাত্রাপথে তিমিরা কিছুই খায় না। তাই যাওয়ার আগেই পেটপুরে খেয়ে নেয়। এই খাবার থেকে পাওয়া শক্তির সাহায্যেই তিমিরা বহু দূর গিয়ে বাচ্চা জন্ম দেয় এবং সেগুলো লালন-পালন করে। পরে বসন্ত বা গ্রীষ্মের দিকে আবার নিজ ঠিকানায় ফিরে আসে।

গবেষণায় তিন ধরনের তিমির গানের তথ্য পাওয়া গেছে। সেগুলো হলো নীল তিমি, হামব্যাক তিমি ও ফিন তিমি। এর মধ্যে নীল তিমি শুধু 'ক্রিল' নামে এক ধরনের চিংড়িজাতীয় মাছ খেয়ে থাকে। হামব্যাক তিমি ক্রিলের পাশাপাশি 'অ্যাংকোভি' নামের মাছের ঝাঁক থেকে খাবার সংগ্রহ করে। তবে এই খাবার প্রতি বছর একই রকম থাকে না।

কনভারসেশনের গবেষণাটি শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। তখন সমুদ্রে দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ চলছিল। এতে উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে তিমিসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর খাবারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। গবেষণায় দেখা যায়, ওই তাপপ্রবাহের সময় তিন প্রজাতির তিমি সবচেয়ে কম গান গেয়েছিল। আর পরের দুই বছর পরিস্থিতির উন্নতি হলে সেগুলোর গানের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

এ থেকেই প্রথম জানা যায়, খাবারের সঙ্গে তিমির গানের সম্পর্ক রয়েছে। এরপর বিগত ৫০ বছরে অ্যাংকোভি মাছ বৃদ্ধি পেয়েছে–এমন এলাকায় নজর রাখা হয়। দেখা যায়, সেসব এলাকায় হামব্যাক তিমির গান ব্যাপক হারে বেড়েছে। এই গানের সঙ্গে যে মাছের সম্পর্ক রয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তিমিগুলোর ত্বক পরীক্ষা করে। ওই মাছ খাওয়ার ফলে সেগুলোর ত্বকে পরিবর্তন এসেছিল। নীল তিমির ওপর একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়েও সেগুলোর খাবারের সঙ্গে গানের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

তথ্যসূত্র: দ্য কনভারসেশন

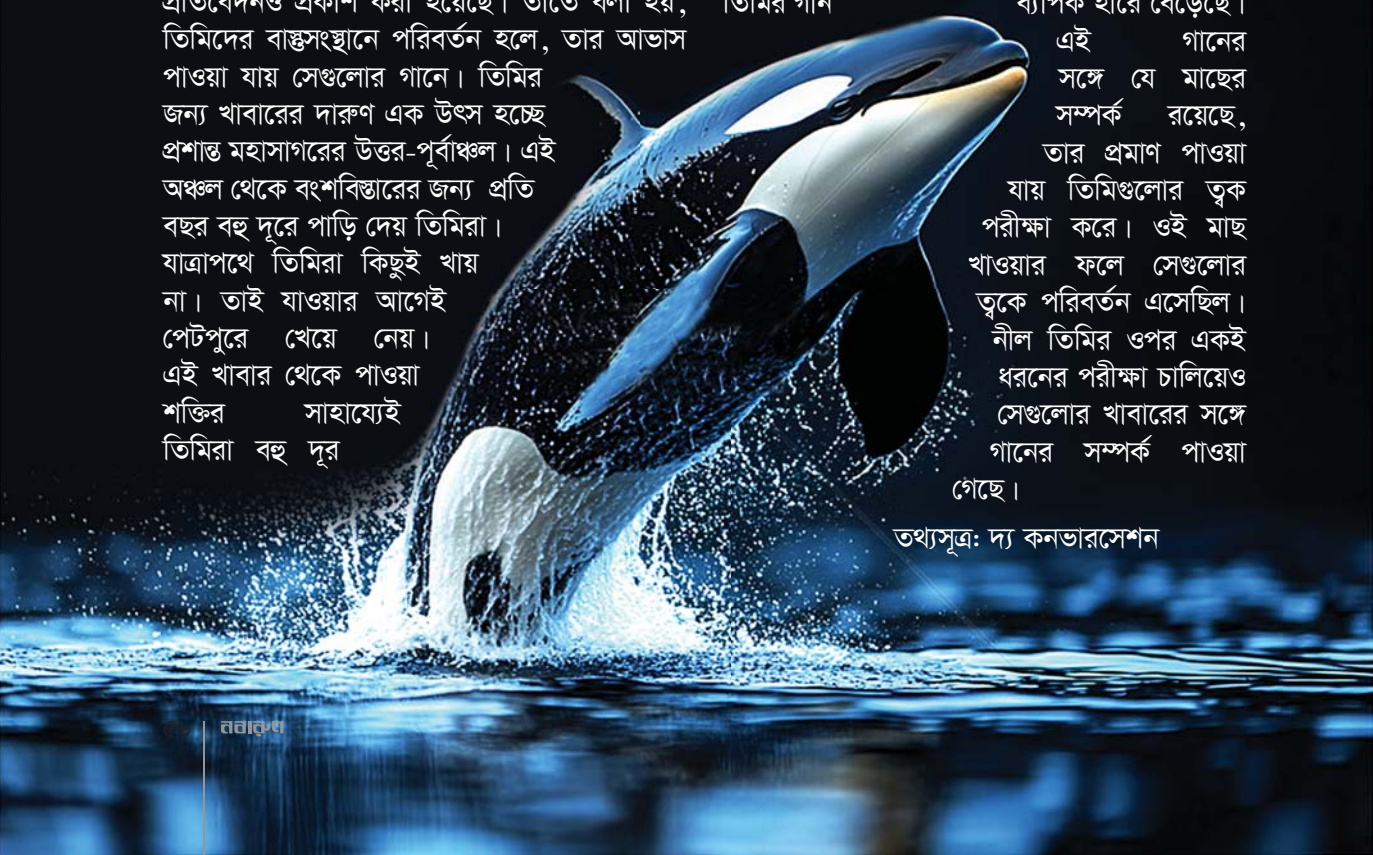

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য

ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সবার জানা দরকার। সেটা হলো কোষ্ঠকাঠিন্য। সাধারণত বয়স ভেদে বাচ্চারা দিনে ১ বা ২ বার মলত্যাগ করে থাকে। কখনো যদি তার অনিয়মিত হয় অথবা অতিরিক্ত শক্ত বা শুষ্ক হয় তখন তা বাচ্চাকে নানারকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন করে। আবার এই কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টিতে বাচ্চার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাস একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বেশিরভাগ সময় ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য যখন মলত্যাগ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায় তখন তারা মলত্যাগের ব্যাপারটা চেপে যেতে চেষ্টা করে। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশন এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে বাচ্চার খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চার ব্যাপারে। বয়স ভেদে বাচ্চাদের দৈনিক ১-২ লিটার পানি এবং তরলজাতীয় খাবার খাদ্যতালিকায় থাকা জরুরি। অতিরিক্ত পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম, দুধও বাচ্চাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি উপাত্ত।

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে বাচ্চাদের ক্ষুধা কমে যায়, খাবারের প্রতি চাহিদা কমে আসে, সর্বোপরি দিনে দিনে ওজন কমতে থাকে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। পেটে ব্যথা, পেট ফুলে ওঠা, ইউরিনারি সিস্টেম বাধাগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদিও কোষ্ঠকাঠিন্যের উপসর্গ। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে বাচ্চাদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার অর্থাৎ আঁশযুক্ত খাদ্যের একটি সুষম সমন্বয় করতে হবে।

প্রতিদিন ১টি অথবা ২টি খোসাযুক্ত ফল, অন্তত ১ ভাগ শাক এবং ২ ভাগ সবজি খাদ্য তালিকায় থাকা জরুরি। প্রোটিনের প্রধান উৎস হিসেবে শুধু মাংসকে প্রাধান্য না দিয়ে বিভিন্ন রকম মাছের উপস্থিতি রাখতে হবে। কুসুম গরম দুধ কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে সাহায্য করে। স্ন্যাকস অথবা ফিংগার ফুড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বিভিন্ন ফল অথবা সালাদ। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে অত্যন্ত জরুরি সঠিক পরিমাণে শরীরচর্চা। বয়সভেদে ১-৩ ঘণ্টা সূর্যের আলোয় খেলাধুলা করা বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি, যা তার ডায়জেস্টিভ সিস্টেমকে সচল রেখে খাদ্যের হজমজনিত সমস্যা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবে।

শরীর সুস্থ থাকলে মন ভালো আর মন ভালো থাকলে লেখাপড়া করতে ভালো লাগে। তোমাদের সবার সুস্থতা কামনা করি।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'অদম্য নারী পুরস্কার-২০২৫' প্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন। ৮ই মার্চ ২০২৫ -পিআইডি

'অদম্য নারী পুরস্কার' পেলেন যারা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলসহ দেশের আরো অদম্য পাঁচ নারীর হাতে 'অদম্য নারী পুরস্কার-২০২৫' সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৮ই মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

এবার পাঁচজন নারী ছাড়াও 'অদম্য নারী পুরস্কার-২০২৫'- এর বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল। জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের পক্ষে সম্মাননা নেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি।

অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন–অর্থনীতিতে শরিফা সুলতানা, শিক্ষা ও চাকরিতে হালিমা বেগম, সফল জননী মেরিনা বেসরা, জীবন সংগ্রামে জয়ী লিপি বেগম, সমাজ উন্নয়নে মো. মুহিন (মোহনা) ।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ।

সম্মাননা পেলেন ঢাকা বিভাগের ৫ অদম্য নারী

ঢাকা বিভাগের সংগ্রামী পাঁচজন নারী পেয়েছেন 'অদম্য নারী পুরস্কার- ২০২৪'। সম্প্রতি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়নে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই পাঁচ নারীকে পুরস্কার তুলে দেন সমাজকল্যাণ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশীদ।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী ক্যাটাগরিতে রাজবাড়ির স্বপ্না রানী ঘোষ, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জের মাসুদা আক্তার, সফল জননী ক্যাটাগরিতে কিশোরগঞ্জের সেলিনা মজিদ, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা ফরিদপুরের লিপি বেগম এবং সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখায় ফরিদপুরের সামর্তবান। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে অনুষ্ঠান মঞ্চে সম্মাননা ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিভাগের ১৩ জেলার ৫৮ জন অদম্য নারী পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পান। সেখান থেকে ৫ জনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

নিজের তৈরি উড়োজাহাজে জুলহাস

ইচ্ছাশক্তি এবং চেষ্টা থাকলে অনেক কঠিন কাজও করা সম্ভব হয়, যা প্রমাণ করলেন মানিকগঞ্জের এক তরুণ। নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি তৈরি করেছেন এক উড়োজাহাজ। শুধু তৈরিই নয়, নিজে সফলভাবে সেটি আকাশেও উড়িয়েছেন। নিজের তৈরি উড়োজাহাজ আকাশে উড়িয়ে সবাইকে রীতিমতো চমকে দিলেন তরুণ উদ্ভাবক জুলহাস মোল্লা (২৮)। তার বাড়ি মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার তেওতা ইউনিয়নের ষাইটঘর তেওতা গ্রামে। দীর্ঘ চার বছর চেষ্টার পর উড়োজাহাজ তৈরিতে সফলতা পেয়েছেন তিনি। ৪ঠা মার্চ দুপুরের দিকে উপজেলার জাফরগঞ্জ এলাকার যমুনা নদীর চরে জুলহাস তার তৈরি উড়োজাহাজ আকাশে উড্ডয়ন করান। তার বিমানটি প্রায় ৫০ ফুট ওপরে উঠতে সক্ষম হয়। জুলহাস মোল্লা বর্তমান শিবালয় উপজেলার ষাটঘড় তেওতা এলাকার জলিল মোল্লার ছেলে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে জুলহাস পঞ্চম। এসএসসি পাশের পর টাকার অভাবে লেখাপড়ার ইতি টেনে ঢাকায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করছেন ২৮ বছরের এই তরুণ। তার এই সাফল্য দেখতে স্থানীয় লোকজনের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেখানে হাজির হয়েছিলেন। তরুণ উদ্ভাবক জুলহাস মোল্লা বলেন, প্রথমে রিমোট কন্ট্রোল উড়োজাহাজ বানিয়ে আকাশে উড়ানোর পর থেকে ইচ্ছা জাগে নিজে উড়োজাহাজ তৈরি করে আকাশে উড়াবো। এই চিন্তা থেকেই উড়োজাহাজ তৈরির জন্য গবেষণা শুরু করি। তিন বছর গবেষণা আর এক বছর উড়োজাহাজটি তৈরি করতে লেগেছে। দীর্ঘ চার বছরের পরিশ্রমের পর আজকে আমি সফল হয়েছি। নিজের তৈরি করা উড়োজাহাজে নিজেই পাইলট হয়ে আকাশে উড়েছি।

একদিনে ২৩ হাজার গাছ লাগানো

নাম তার এভান মোজিস। যদি এই মানুষটি কাজ বন্ধ করে দেয় তবে পৃথিবীতে গরম আরো বেড়ে যেতে পারে। কী কাজ বলেন তো? হ্যাঁ, গাছ লাগানো। এভান যিনি বছরের পর বছর ধরে পাহাড় এবং মরুভূমিতে গাছ লাগাচ্ছেন এবং এ সমস্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করছেন। আপনি জেনে অবাক হবেন পৃথিবীতে এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এক দিনে ২৩ হাজারটি গাছ লাগিয়ে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছেন! এ অসাধারণ কাজের জন্য তাকে সরকার দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। এভান মোজিস জীবনের অনেকটা সময় পরিবেশের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করেছেন। পাহাড় এবং মরুভূমির মতো কঠিন জায়গায় তিনি নিরলসভাবে গাছ লাগিয়ে যাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং পৃথিবীকে আরো সবুজ ও বাসযোগ্য করে তোলা। মজার বিষয় হলো তিনি এ মহৎ কাজের জন্য কোনো আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেন না। গাছ লাগানো তার কাছে শুধু একটি কাজ নয় বরং এটি একটি নৈতিক দায়িত্বও। প্রকৃতির প্রতি তার এই অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়। এ ধরনের প্রচেষ্টা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে একজন মানুষ যদি সত্যিই কোনো কাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তবে তিনি বড়ো বড়ো পরিবর্তন আনতে পারেন। গাছ লাগানোর মাধ্যমে এভান শুধু পরিবেশ রক্ষা করছেন তা নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ভালো পৃথিবী রেখে যাচ্ছেন। তার পরিশ্রম এবং ধৈর্যের জন্য তিনি আজ পরিবেশ রক্ষার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছেন। তার কাজ সারা পৃথিবীর জন্য একটি অনুপ্রেরণা। তার দেখানো পথে অনেকে আজ পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসছেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

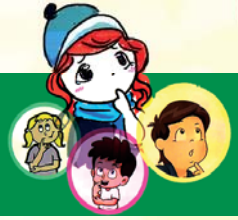

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেসামরিক পুরস্কার, ৫. পত্র, ৬.জ্ঞান-বুদ্ধি, ৯. গাছে ধরে এমন এক ধরনের পানীয়, ১০. কুঠার দিয়ে কাঠ কাটা যার পেশা

উপর-নিচ: ১. মুক্ত, ২. যে দেশে শস্যের উৎপাদন নদীর জলের উপর নির্ভরশীল, ৩. পুকুর, ৪. বিক্রির জন্য দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ, ৬.অভিবাদন, ৭. লতা, ৮.মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, ১১.আংটি

১. স্বা	ধী	২. ন	তা	৩. পু	র	স্কা	৪. র
ধী	■	দী	■	স্ক	■	■	ফ
ন	■	মা	■	রি	■	৫. পা	তা
■	■	তৃ	■	ণী	■	■	নি
■	৬. আ	ক	৭. ল	■	■	৮. ম	■
■	দা	■	তি	■	■	রি	■
৯. ডা	ব	■	১০. কা	ঠু	১১. রি	য়া	■
■	■	■	■	■	ৎ	■	■

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	+		-	৫	=	
/	■	+	■	+	■	-
	*	২	-		=	৫
+	■	+	■	-	■	+
২	+		+	২	=	
=	■	=	■	=	■	
	+	৬	-		=	৭

ছক মিলাও

শব্দ ধাধাঁর মতোই এক ধরনের ধাধাঁ ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: সিয়েরা লিওন, অথবা, কম, নায়েব, লিলিপুট, রস, সপুষ্পক, ঘাস, গুণবাচক, কর, সরস, রশি

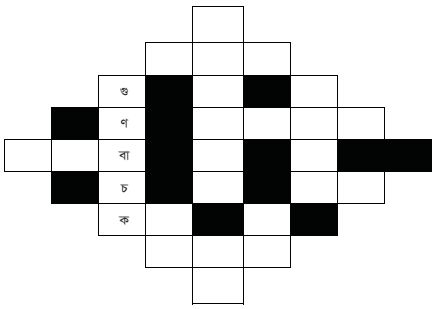

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

১৭			২৮		৭৪	৭৩	৭০	৬৯
	২১	২০		৩০	৭৫	৭২	৭১	
	২২		২৬		৭৬	৭৭		৬৭
	১৩	২৪		৩২	৮১	৭৮	৬৫	
১১		৩৫			৮০	৭৯		৬৩
	৯		৩৯	৪০			৬১	৬০
১		৩৭			৫০	৫৩		
		৬	৪৩		৪৯		৫৫	
	৪		৪৪			৪৭		৫৭

ফেব্রুয়ারি মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

ব	র	ক	ত	■	আ	গু	ন
■	■	■	■	■	রে	■	ত
এ	কু	শে	প	দ	ক	■	ম
ক	■	খ	■	■	ফা	■	স্ত
গুঁ	■	র	বি	■	ল্লু	■	ক
য়ে	■	■	ব	■	ন	■	■
■	দা	■	র্জ	■	■	■	■
ত	ম	দ্দু	ন	ম	জ	লি	স

ছক মিলাও

				গা				
			স	জী	ব			
		চা	■	উ	■	■		
	■	চা	রু	ল	তা	■	দা	
প	তা	কা	■	হ	■	কা	গ	জ
	■	হি	ড়ি	ক	■	ন	■	
		নী	■	■	ঘ	ন		
			ব	ছ	র			
				দ্দ				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৪	*	৩	-	৭	=	৫
*	■	*	■	*	■	*
৪	-	২	*	১	=	২
-	■	-	■	-	■	-
৯	*	১	-	৪	=	৫
=	■	=	■	=	■	=
৭	-	৫	+	৩	=	৫

নাম্ব্রিক্স

৭	৬	৫	৪	৩	৭০	৭১	৭২	৭৩
৮	২৭	২৮	২৯	২	৬৯	৮০	৭৯	৭৪
৯	২৬	৩১	৩০	১	৬৮	৮১	৭৮	৭৫
১০	২৫	৩২	৩৫	৩৬	৬৭	৬৬	৭৭	৭৬
১১	২৪	৩৩	৩৪	৩৭	৬৪	৬৫	৬০	৫৯
১২	২৩	২২	৩৯	৩৮	৬৩	৬২	৬১	৫৮
১৩	১৪	২১	৪০	৪৭	৪৮	৪৯	৫৬	৫৭
১৬	১৫	২০	৪১	৪৬	৪৫	৫০	৫৫	৫৪
১৭	১৮	১৯	৪২	৪৩	৪৪	৫১	৫২	৫৩

নীলাদ্রি শেখর সমদ্দার, দ্বিতীয় শ্রেণি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল, উত্তরা, ঢাকা

সাবিত হক, পঞ্চম শ্রেণি, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা

মৌমিতা আক্তার বন্যা, পঞ্চম শ্রেণি, নতুন কুঁড়ি কিন্ডার গার্টেন, শেরপুর

মোছা. ওকি, একাদশ শ্রেণি, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া

জারিন আক্তার, দ্বিতীয় শ্রেণি, রোজবাড কিন্ডার গার্টেন স্কুল, বারহাট্টা, নেত্রকোণা

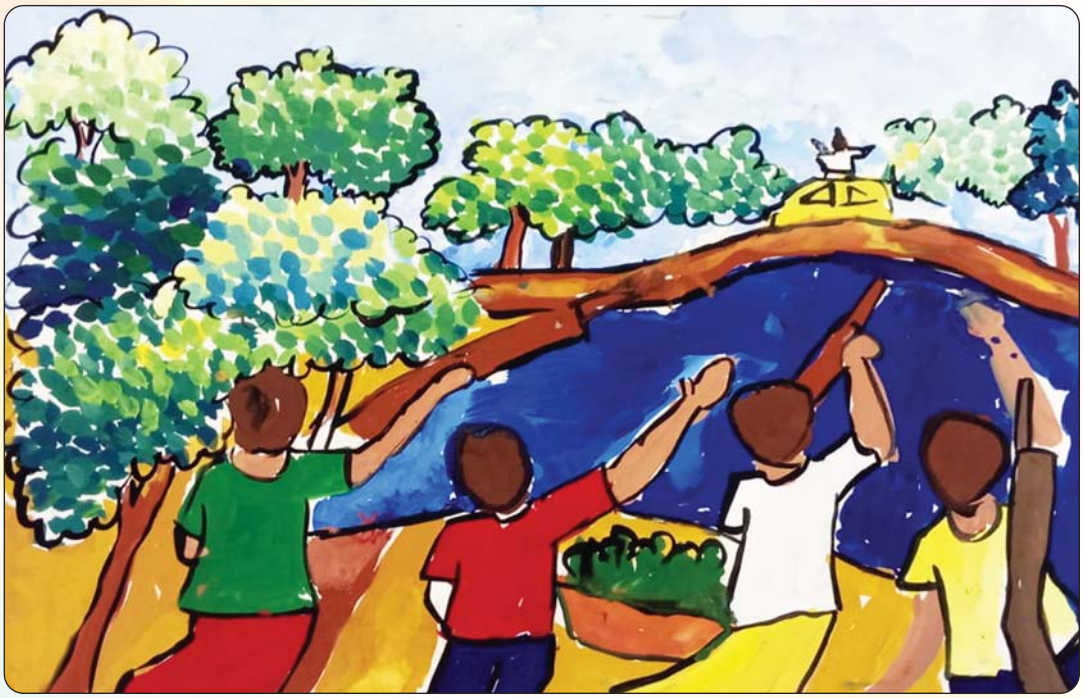

জয়িতা দে, অষ্টম শ্রেণি, শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

তাইফুর আলম, পঞ্চম শ্রেণি, হাজীগঞ্জ চিলড্রেন একাডেমি, চাঁদপুর

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-09. March 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

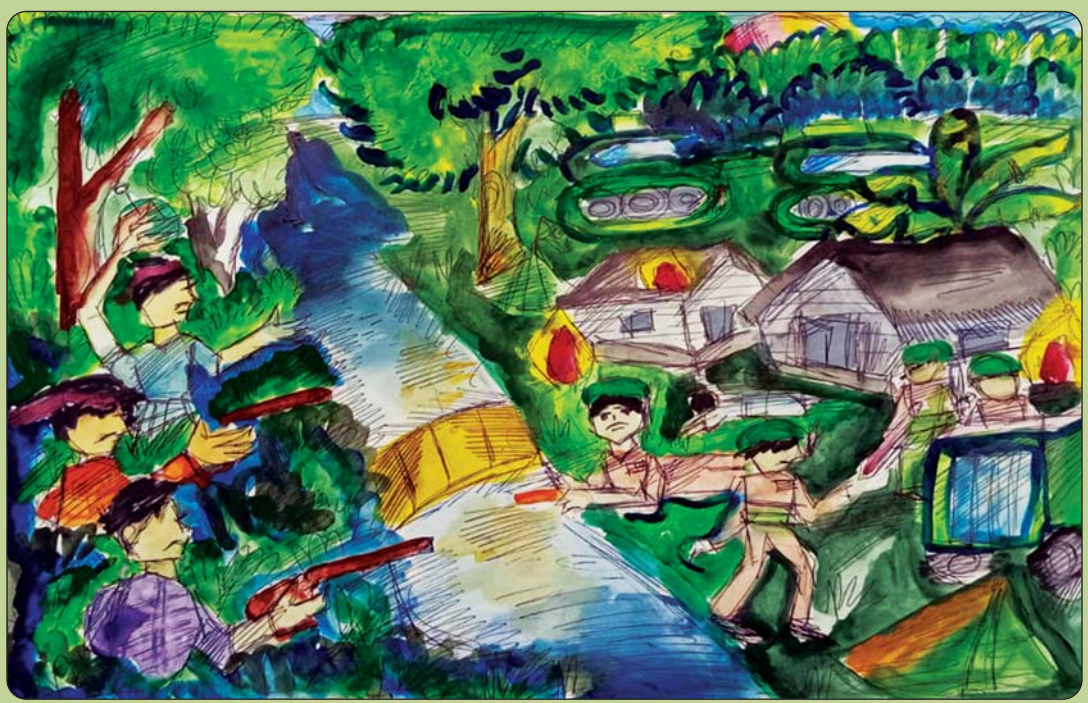

অনিন্দিতা ভাবুক, পঞ্চম শ্রেণি, শহিদ বীরউত্তম লে. আনোয়ার গালর্স স্কুল, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা